মাটি-ঘেঁষা মানুষ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

4835

18.4.58

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট · কলিকাতা — ৬

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৬৪

॥ আড়াই টাকা ॥

৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬, ডি, এম, লাইব্রেরীর
পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি,
বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬, বাণী-শ্রী প্রেস হইতে
শ্রীসুকুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশকের কথা

অনিয়মিত ভাবে মানিক বাবু 'মাটি-ঘেঁষা মানুষে'র কিস্তি লিখে দিচ্ছিলেন এবং সেই অনুসারে তা ছাপা হচ্ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উপন্যাস তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না।

অসম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশ করা চলে না। মুদ্রিত অংশ নষ্ট করাও সম্ভব নয়। তাই 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ' সম্পূর্ণ করে দিলেন, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

মানিকের দুরূহ রচনা—পদ্ধতি একাগ্র সাধনায় সুধীরঞ্জন আয়ত্ত করতে পেরেছেন বলেই উপন্যাসের শেষাংশে কোন অসঙ্গতি চোখে পড়ে না।

সুধী পাঠক মাত্রেই দুই লেখকের লিখিত অংশ হয় তো চিহ্নিত করতে পারবেন। তাই সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি না।

আমাদের প্রকাশিত মানিক—সাহিত্য

পেশা

শুভাশুভ

চালচলন

সার্বজনীন

অহিংসা

সহরতলী (২য় খণ্ড)

অন্য লেখকের কথা

প্রথমে মানিক বাবুর ইচ্ছে ছিল 'চাষীর মেয়ে—কুলির বৌ' নামে একটি বড় উপন্যাস লিখবেন।

পরে তাঁর সে—মতের পরিবর্তন হল। এবং তিনি স্থির করলেন 'চাষীর মেয়ে' ও 'কুলির বৌ' নাম দিয়ে দুটি ছোট ছোট উপন্যাস লিখবেন।

অবশেষে তাঁর সে-মতও পাল্টে গেল এবং 'চাষীর মেয়ে' পরিবর্তন করে তিনি নতুন নামকরণ করলেন, 'মাটি-ঘেঁষা মানুষ'।

'মাটি-ঘেঁষা মানুষ' সম্পূর্ণ করবার আগেই 'কুলির বৌ' এর একটি মাত্র কিস্তি তিনি লিখেছিলেন।

সঙ্গতি রক্ষার জন্যে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'কুলির বৌ' এর একটি মাত্র অধ্যায়ের সামান্য অংশ পরিবেশ অনুযায়ী 'মাটি-ঘেঁষা মানুষে' জুড়ে দেয়া সমীচীন মনে করেছি। তাঁর অন্য বই থেকেও মাত্র একবার সংলাপ ও বর্ণনাভঙ্গি অনুকরণ করেছি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় মধ্য-বিশ-শতকের অদ্বিতীয় বিদগ্ধ ঔপন্যাসিক যিনি নিরাপদ অবাস্তব পটভূমিকার সৃষ্টি করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করতে পারেন নি।

তা করতে পারলে তাঁর মতো প্রতিভার পক্ষে ব্যক্তিগত জীবনে সম্পদের অধিকারী হওয়া কঠিন হত না। কিন্তু বিশৃঙ্খল সমাজের নানা সমস্যা এড়িয়ে অবাস্তব রোমান্টিক চরিত্র সৃষ্টি করে কিংবা ভাবগত আদর্শের তুলি বুলিয়ে পাঠক সাধারণের চিত্ত জয়ের চেষ্টা তিনি করতে পারেননি। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনো এমন লঘু জীবনবোধের পরিচয় দিতে পারে না।

তাই তাঁর পাঠক সংখ্যা সীমাবদ্ধ। কারণ অনেক লেখক যেমন সকল সমস্যা ভুলে আপন কল্পনা বিলাসের সাহিত্য লোকে মুক্তি খোঁজেন, পাঠকরাও তেমনি গল্প বা উপন্যাসে দৈনন্দিন বিড়ম্বিত জীবনের প্রতিফলন দেখতে চায় না এবং ধিক্কার অথবা নির্মম আক্রমণ সহ্য করতে বিমুখ হয়।

মানিক-সাহিত্যে এমন ছেলে-ভুলোনো ছড়াগান নেই বলে তাঁর গ্রন্থরাজির সংস্করণ রাতারাতি নিঃশেষিত হয় না।

শিথিল সমাজ ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষ এবং এই সমাজের চক্রে পিষ্ট চরিত্রগুলির জন্যে গভীর মমত্ববোধ, মানিক বাবুর ব্যক্তিগত জীবনও বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল। কারণ তিনিও ছিলেন সেই চরিত্র-গুলির মধ্যে একজন। তাঁর জগত রূঢ় কঠিন বাস্তবতার প্রাচীরে সীমিত ছিল।

এলিয়টের মতো, গ্রেহাম গ্রীনের মতো, ইভলীন ওয়ার মতো বা আরও অনেক লেখক লেখিকার মতো ভগবানের ওপর সুখ-দুঃখের দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া তাঁর মতো সমাজ-সচেতন লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিলনা বলে তিনি একই জীবনে জন্ম-জন্মান্তর দেখাতে চেয়েছিলেন মানুষের ব্যাপক সামাজিক চেতনার মধ্যে দিয়ে।

মানিক বাবু নিজেই বলেছেন, 'সমাজের কোন শ্রেণীতে ভাঙ্গন ধরার অর্থ অনেকে মনে করেন মানুষগুলিরও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া—আসলে মানুষগুলির জীবনও নতুন দিকে গতি পায়, নতুন রূপ গ্রহণ করতে থাকে।'

তাই বোকা-হাবা চাষীর মেয়ে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায় সমাজবোধের দীর্ঘশ্বাসে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা ভেঙে কেউ সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে।

মাণিকবাবুর জীবিতকালে যদি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হতো তাহলে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুযায়ী তাঁর সীমাবদ্ধ পরিধির কঠিন প্রাচীর শিল্পবোধের গভীরতায় টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারতো।

এবং হয়তো মহত্তরো-বৃহত্তরো জীবনের চিত্রবিন্যাস তিনি করতে পারতেন।

কিন্তু তিনি যে সমাজে বেড়ে উঠেছিলেন সেখানে তাঁর মতো লেখকের পক্ষে একাজ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর সৃষ্ট বহু চরিত্র ব্যাপক জীবনের উপাদান বহন করে আনলেও, মানবতার চরম শিখরে পৌছবার আগ্রহে তারা শুধু দুস্তর স্তর ভাঙবার প্রাণপণ প্রয়াস করে হিমশীতল ব্যর্থতায় জীবন ভরে তোলে।

কেউ কেউ মধ্যবিত্ত—স্বভাবগত লালসায় ও ব্যর্থতার পীড়নে শেষ' রক্ষা করতে না পেরে সমাজের কোন ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে সুখী জীবনের তোরণদ্বারে উত্তীর্ণ হয়।

ইচ্ছে করলে মানিক বাবু নিজেও একাজ অনায়াসে করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সামাজিক জ্ঞানের গভীরতা ও জাত-সাহিত্যিক উপলব্ধির অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁকে সুড়ঙ্গ পথের সাহায্যে তথাকথিত সার্থক জীবনের সুমেরু শিখর শিরে উত্তীর্ণ হতে দেয়নি।

তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসম্পূর্ণ উপন্যাস সম্পূর্ণ করা বর্তমান কালের কোন লেখকের পক্ষে শুধু দুঃসাধ্য নয়—হয়তো একেবারেই অসম্ভব।

কারণ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনকে দেখতে হলে গভীর সামাজিক জ্ঞানের তীব্র আলোয় এই সমাজের সকল লোভনীয় বস্তুর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে উগ্র সন্ন্যাস বরণ করতে হবে। এবং দারিদ্র্যের দুঃসহ নিপীড়নেও ধৈর্য্য হারালে চলবে না।

আধুনিক কালের যশ প্রত্যাশী ও স্বাচ্ছন্দ্যবিলাসী লেখকের পক্ষে এমন দৃষ্টিতে জীবনকে দেখা রীতিমতো কঠিন।

তবু এই কথা মনে করে এ গুরু দায়িত্ব বহন করতে স্বীকৃত হলাম, মানিক বাবুর চরিত্রগুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং তারা চলা ফেরা করে নির্দিষ্ট পথ ধরে।

অঙ্ক যত কঠিন হোকনা কেন, ফরমূলা বুঝতে পারলে যেমন পুরে

নম্বর পাওয়া যায়, তেমনি ফরমূলা বুঝতে না পেরে হাজার চেষ্টা করলেও শেষ অবধি খাতার ওপর শূন্য পড়ে।

পুরো নম্বর পাব কি শূন্য পাব তা নিয়ে ভাবনা করবনা। আমি যে সমগ্র মানিক-সাহিত্য পড়ে সেই বিস্ময়কর প্রতিভার জীবনদর্শন উপলব্ধি করবার আন্তরিক চেষ্টা করেছি এবং ক্ষণকালের জন্যেও অবাস্তব চরিত্র-চিত্রণ থেকে বিরত থাকতে পেরেছি—আশা করি সেকথা মনে করে সুধী সমালোচক আমার অসংখ্য ভুলত্রুটি মার্জনা করবেন।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৩রা এপ্রিল : ১৯৫৭

৩৮, গলফ ক্লাব রোড
টালিগঞ্জ
কলিকাতা—৩৩

মাটি-ঘেঁষা মানুষ

এখন বসন্তকাল।

বসন্ত রোগের কালও বটে। কিন্তু গোড়াতেই সে কথা তুলতে গেলে কেউ হয় তো বলবে, এটা তোমার চাষাড়ে রসিকতা।

খাঁটি বসন্ত এদেশে কটা দিনের ব্যাপার, শীত গ্রীষ্মের কটা দিনের সমতা ফুরোলেই রাতদিনের গরমকালীন ভাগটা হু-হু করে বেড়ে চলে, সে হিসাব করবার জন্যও আবহাওয়া বিভাগ আছে।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। শুক্লপক্ষের শেষের দিক। রাত্রি শেষে ম্লান তারার আবছা আলোয় মাঠে-মাঠে হাঁটতে গেলে শীতের শিশিরেই পা ভিজে যায়। দক্ষিণ ঘেঁষা স্নিগ্ধ হাওয়ায় সর্ব্বাঙ্গ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কাঁচা-মিঠে মেয়ের মতই লাগে সেকেলে এই পুরানো পৃথিবীটা। নিরানন্দের হিংস্র সাপগুলি ফুসলে ফুসলে ছুবলে ছুবলে চলেছে সন্ত্রস্ত অধ্যবসায়ে, তবু যেন মাটির পৃথিবী প্রাণের রসে পুলকময়ী।

কেবল সাপের মতনেরা নয়, এমনি সাপও অবশ্য ফোঁস করে উঠে মানুষকে ছোবল দেয় এখানে-ওখানে। সত্যিকারের বিষাক্ত সাপ।

কামড়ানো কোন ক্ষেত্রেই সাপের অপরাধ নয়। হিংস্র কথাটা সাপের কোন অপবাদ নয়, নিছক সংজ্ঞা মাত্র। তবু যদি গায়ের জোরে নিরীহ অহিংস মানুষকে কামড়ানো

সাপের দোষ ধরা হয়, গোবিন্দের বেলা সাপটার দোষ ছিল না মোটেই। বিষধর কিন্তু বাস্তু সাপ। পোষা সাপের সামিল। অঘোরের বাড়ীর লোকেরা সাপটা দেখলে দাঁড়িয়ে যায়, সেও নির্ভয়ে চলে যায় সামনে দিয়ে। পূজা পায়, দুধ-কলা পায়। গায়ের এক ইঞ্চির মধ্যে মানুষের পা পড়লেও কামড়ে দেবাব সাপ সে নয়।

বাঁধানো সরকারী সড়কটার ধারেই অঘোরের ঘর। পাশের গাঁয়ের গোবিন্দ সাপটার শৈশব থেকে এই পথ দিয়ে কতবার যাতায়াত করেছে ঠিক নেই, গত দু'বছর ছুটির দিন ছাড়া রোজ নিয়মিতভাবে দু'বার যায় আসে—ভোর রাত্রে যায় আর বিকালে বা সন্ধ্যাকালে ফেরে। সাপটা কয়েকবার তার নজরেও পড়েছে।

সেদিন অল্প কুয়াশা ভরা আবছা ভোরে সাপটা রাস্তায় একটা ব্যাঙ ধরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কোনদিকে না তাকিয়ে জোরে জোরে ষ্টেশনের দিকে যেতে যেতে গোবিন্দ তার লেজটা মাড়িয়ে দিল।

ভোরের দিকে এ সময় ব্যাঙেরা এ-পাশ ও-পাশ থেকে একে-দুয়ে রাস্তা পেরিয়ে গর্তে ফেরে। সাপটাও আসে ব্যাঙ ধরতে।

কত দিন হয় তো তার কাছ দিয়ে কোনদিন হয় তো বা তাকে ডিঙ্গিয়ে গোবিন্দ নিরাপদে চলে গেছে। আশ্চর্য কি ?

আজ লেজে পা পড়ায় সেই পায়েই সে ছোবল বসিয়ে দেয়।

দাঁত বসিয়ে মাথা একটু বাঁকিয়ে তবে বিষ ঢেলে দেওয়া —মুহূর্ত্তের ব্যাপার। তারই মধ্যে গোবিন্দের সর্ব্বাঙ্গে অদ্ভুত একটা শিহরণ বয়ে যায়।

রেবতী গিয়েছিল ঝোপঝাড় ঘেরা ডোবার ঘাটে। গোবিন্দের চীৎকার শুনে সে-ই সবার আগে ছুটে এসে ছাখে, মাথাটা থেঁতো হয়ে তাদের বাস্তু সাপটা রাস্তায় ছটফট করছে আর হাফপ্যান্ট পরা মানুষটা ছু'হাতে হাঁটুর ওপরে পা'টা চেপে ধরে রেখে চেঁচাচ্ছে।

ঃ কামড়ে দিয়েছে ?

গোবিন্দ বলে, কামড়েছে। চট্ করে তোমার কাপড়ের পাড়টা ছিঁড়ে দাও।

ঃ পাড় ? নতুন কাপড় যে ? ছুটে দড়ি এনে দিচ্ছি।

সে দৌড়তে যাবে, ফস করে গোবিন্দ তার আঁচল ধরে টেনে নিয়ে ফড় ফড় করে শাড়ীর একদিকে পাড় অনেকটা ছিঁড়ে ফেলে। টানের চোটে রেবতীকে পাক দিয়ে ঘুরে অতটা কাপড় ছেড়ে দিয়ে খানিকটা বেসামাল হয়ে পড়তে হয়।

সে রেগে বলে, কাপড় টেনো না, আমি ছিঁড়ে দিচ্ছি !

যতটা ছিঁড়ে ফেলেছিল তাই দিয়ে গোবিন্দ হাঁটুর উপরে শক্ত করে পাড়ের বাঁধন দিতে আরম্ভ করলে শাড়ীর পাড় ছেঁড়া অংশটা গায়ে জড়িয়ে পাড়ের বাকীটা রেবতী নিজেই ছিঁড়ে দেয়।

গোবিন্দ যতদূর সম্ভব আঁট করে বাঁধন দেয়।

ততক্ষণে আরও মানুষ এসে জমতে আরম্ভ করেছে।

তারপর গোবিন্দ সার্টের পকেট থেকে ছুরি বার করে দংশনের যায়গাটা গভীর করে চিরে দেয়।

একজন প্রশ্ন করে, কি করে কামড়াল?

অঘোর বলে, এ সাপ তো যেচে কামড়ায় না।

গোবিন্দ জবাব দেয়, লেজে পা পড়েছিল।

অঘোর যেন হাঁফ ছেড়ে বলে, তবে? রাস্তা দেখে চলবে না, লেজে পা দেবে, সাপের কি দোষ?

গোবিন্দ বলে, দোষের কথা হচ্ছে না দাদা। একটা গাড়ী-টাড়ী আনো? নয়তো মাচা-টাচা করে হাসপাতালে দেবার ব্যবস্থা কর সবাই। এ সাপের বিষ ভারি চড়া—দেখতে দেখতে পা-টা কি হয়ে যাচ্ছে দেখছ তা? হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে থেকো না, চটপট একটা ব্যবস্থা করে ফেল।

কুঞ্জ বলে, নকুলকে ডাকব না?

গোবিন্দ বলে, নকুল ওঝা-টোঝার কম্ম নয়। হাসপাতালে নিয়ে চল চটপট।

কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

তখনো ভাল করে ফর্সা হয়নি। তবে গোটা দুই লণ্ঠন এসে গিয়েছিল।

গোবিন্দের যন্ত্রণায় বিকৃত মুখের দিকে রেবতী পলকহীন চোখে চেয়ে মুখ বাঁকিয়ে কি যেন ভাবে। সিক্তবসনা তার দিকে কে তাকাচ্ছে না তাকাচ্ছে এটা তার খেয়ালও থাকে না। আত্মভোলা হয়ে এতগুলি পুরুষের

প্রায় গা ঘেঁষে সে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে এটা এই অবস্থাতেও অনেকের বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে।

একটা মানুষকে সদ্য সদ্য ভয়ানক বিষাক্ত সাপ কামড়েছে, হয় তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মানুষটা মরে যাবে তবু অল্পক্ষণের জন্য লজ্জা-সরম ভুলবার অধিকারও রেবতীর নেই।

বড় ভাই কুঞ্জ কড়া সুরে বলে, ঘরে যা না ?

রেবতী আনমনে বলে, যাই।

কিন্তু সে নড়ে না।

গোবিন্দের ক্ষতস্থানে লতা-পাতার ও গুণযুক্ত দ্রব্যাদি দেওয়া সুরু হয়েছিল বিজ্ঞ কয়েকজন হাজির হবার পরেই। গোবিন্দ আপত্তি করেনি।

তাকে হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থাও হচ্ছিল। মথুর গাড়ী জুততে গেছে, এসে পড়ল বলে।

অঘোর মেয়েকে ধমক দিয়ে বলে, ঘরে যা না হারামজাদি, কাপড় ছাড় না গিয়ে ?

একটু তফাতে কয়েকটি মেয়ে বৌ জড়ো হয়েছিল, তার মধ্য থেকে চারুর তীক্ষ্ণ গলার ঝাঁঝালো ধমক আসে, বুতি ! এদিকে আয় মুখপুড়ী মেয়ে।

রেবতীও তীক্ষ্ণ গলা চড়িয়ে বলে, যাচ্ছি গো যাচ্ছি। একটা মানুষের মরণ-দশা, তোমরা যেন কেমন কর।

বলে পাগলী মেয়ে করে কি, হাঁটু পেতে বসে আঁচল দিয়ে গোবিন্দের ক্ষতস্থানের ছেঁচা লতা-পাতা বিষ-চোষা পাথর আর রক্ত আঁচল দিয়ে মুছে সেইখানে মুখ দিতে যায়।

গোবিন্দ ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থাতেই সে রেবতীর মাথাটা হাত দিয়ে ঠেলে রেখে একটু জড়ানো সুরে বলে, করছ কি ?

রেবতী অধীর হয়ে বলে, আঃ হাত সরাও না। বিষটা চুষে নেব। আমার মুখে ঘা-টা কিছু নেই।

এই কথাই এতক্ষণ ভাবছিল রেবতী।

বছর দেড়েক আগে তার মামা-মামী এসেছিল কয়েক দিনের জন্য। তারা নতুন লোক, বাস্তু সাপ নিয়ে ঘর করার অভ্যাস ছিল না। মামাকে কামড় দিয়েছিল এই সাপটাই।

রেবতীর মনে আছে নানা রকম টোটকা ব্যবস্থা সুরু হবার আগেই মামী কামড়ানোর যায়গায় মুখ লাগিয়ে চুষে-চুষে বিষ আর রক্ত থুথু করে ফেলে দিয়েছিল অনেকক্ষণ ধরে।

মামা নাকি বেঁচে গিয়েছিল মামীর জন্যই।

এ লোকটা তার কেউ নয়। কিন্তু যোয়ান একটা মানুষ তো ? তাদের ঘরের সাপটা একে কামড়েছে তো ?

তার কি উচিত নয় বিষটা চুষে বার করে ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করা ?

দাঁতগুলি ভাল ছিল না মামীর, মাড়ি ফুলে ব্যথা হত। 'বষ চুষে বার করে স্বামীর প্রাণটা বাঁচিয়ে দিলেও মামীর মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল।

বেশ কিছুকাল সে কি যন্ত্রণাভোগ !

ডাক্তার বলেছিল, যার মুখে ঘা নেই, দাঁত ভাল, তারই শুধু সাপের বিষ চুষে বার করা সাজে।

কথা বলতেও দারুণ কষ্ট হত, তবু মামী কোন রকমে বলেছিল, আর কে মুখ দিয়ে বিষ টানবে ?

ডাক্তার সহানুভূতির সঙ্গে সায় দিয়ে মাথা হেলিয়েছিল।

সত্যই তো। আর কিছু নয়, সাপের বিষ। কৈকেয়ী যে দশরথের ক্ষত থেকে পুঁজ-রক্ত চুষে বর লাভ করেছিল, তার চেয়েও ঢের বেশী কঠিন কাজ। বৌ ছাড়া কে এগিয়ে যাবে ?

বৌ টেনে বার করে স্বামীর গায়ের বিষ।

ভিন্ গাঁয়ের এ মানুষটা তার অজানা অচেনা, মাঝে মাঝে সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছে এই মাত্র।

তাই যত তাড়াতাড়ি বিষ টেনে নেওয়া যায় ততই যে ভাল সেটা জানা থাকলেও এতক্ষণ তার একটু লজ্জা করছিল, দ্বিধা বোধ করছিল।

নইলে হয় তো তার নতুন শাড়ীটার পাড় ছিঁড়ে পা বেঁধে গোবিন্দ যায়গাটা চিরে দেওয়া মাত্র সে ক্ষতের দিকে মুখ বাড়িয়ে দিত।

সকলে থ বনে চেয়ে থাকে।

অঘোর কটমট করে চেয়ে থাকে, কুঞ্জের দৃষ্টি দেখে মনে হয় সে বুঝি বোনটাকে ভস্ম করে ফেলবার চেষ্টা করছে !

রাজুর গলা চিরে তীক্ষ্ণ ডাক বার হয়, বুতি। বজ্জাত নচ্ছার মেয়ে, ইদিক এলি ?

কিন্তু রেবতী তখন কালা হয়ে গেছে।

মানুষটাকে সে বাঁচাবেই।

যে যাই বলুক আর যত শাসনই তার কপালে জুটুক।

কোনদিকে না তাকিয়ে ক্ষতস্থানে মুখ দিয়ে সে প্রাণপণে রক্ত চুষে নিয়ে থুতু থুতু করে ফেলে দিতে থাকে। রক্তের সঙ্গে যে বিষও আসছে সেটা সে টের পায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

মুখের মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হয়। ধীরে ধীরে জ্বালা বাড়তে থাকে।

কতক্ষণ সে তার দুঃসাহসী চিকিৎসা চালিয়ে যেত বলা যায় না, খানিক পরে রাজু এসে তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে চিকিৎসা বন্ধ হয়।

বার বার থুতু ফেলতে ফেলতে রেবতী বলে মুখ জ্বালা করছে, ধুয়ে আসি, ছাড়ো।

ভায়ের বৌয়ের ফোলা মুখের কথা রাজুর স্মরণ ছিল, সে বোনঝির হাত ছেড়ে দেয়।

রেবতী ছুটে যায় ডোবার ঘাটে।

বার বার কুলকুচো করে মুখ ধোয়, কিন্তু জ্বালা যেন না কমে বেড়েই চলে।

ঢোঁক গিলতে রেবতী সাহস পায় না। বিষ যদি পেটে চলে যায়! সে নিজেই যদি মরে যায়!

সেইখানে ডোবার ঘাটে তার কাছে হাজির হয় অর্জুন। তার এক হাতে ঘটিভরা লাল টকটকে জল, অন্য হাতে কাগজে মোড়া লাল ওষুদের দানা।

বলে, সাদা জলে নয়, এই জলে কুলকুচো কর। কি কাণ্ড যে তুই করিস!

এ ওষুধটা রেবতীও জানে। সাপে কামড়ালে চেরার মধ্যে এই দানা গুঁজে দিতে হয়।

সে জিজ্ঞাসা করে, ওকে দিয়েছো, যাকে কামড়েছে?

: দিয়েছি। কটা দানা মুখে ফেলে ঘটির জল নিয়ে কুলকুচো কর।

অর্জুন প্রতিবেশী। যোয়ান বয়েসী চাষী। গোড়ায় সে হাজির ছিল না, পরে খবর পেয়ে যখন সে আসে রেবতী তখন গোবিন্দের ক্ষতের বিষ চুষে নিচ্ছিল।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ব্যাপার বুঝেই সে ছুটে গিয়েছিল পরেশ সাহার বাড়ী থেকে পারমাঙ্গানে আনতে।

কুলকুচো করার ফাঁকে ফাঁকে রেবতী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, মোর দাঁত ভাল, মুখ ফুলবে না তো?

অর্জুন তাকে অভয় দেবার বদলে কড়া সুরে বলে, কে জানে ফুলবে কি না! জাতসাপের বিষ সোজা জিনিষ? এত লোক থাকতে তোর বাহাদুরি করতে যাওয়া কেন? ঢং শিখেছিস, না?

: ঢং? ঢং আবার কিসের? ছিল তো সবাই, কেউ এগুলো না কেন? মানুষটা মিছিমিছি মরবে নাকি?

: বড় যে দরদ দেখছি মানুষটার জন্য! খাতিরের লোক বুঝি, অ্যাঁ?

ওষুধের লাল জল খানিকটা প্রায় গিলে ফেলেছিল রেবতী, বিষম লাগায় রেহাই পায়

সামলে উঠে চোখ পাকিয়ে অর্জুনের দিকে চেয়ে বলে, কি বলছ ছ্যাঁচরার মত? লোকটাকে চিনি? জন্মোবয়সে

কথা কয়েছি কোনদিন? খাতিরের মানুষ না তোমার শাউরীর ইয়ে!

সামান্য কথায়, বাহাদুরি করে নিজেকে বিপদে ফেলতে যাওয়ার জন্য স্নেহের ভর্ৎসনায়, রেবতীকে এরকম চটে যেতে দেখে অর্জুন সত্যই ভড়কে যায়। সুর পাল্টে বলে, তা বলছি নাকি? মেয়েছেলে, কি তোর দরকার ছিল ঝন্‌ঝাট করার? সোনারপুরের বিষ্টু মহাজনের ছেলেটাকে জাতসাপে কামড়ালো। বুড়ো ঢোলন ওঝাকে ডাকলে, ডাক্তার ডাকলে, কবরেজ ডাকলে। ঢোলন নিকটে থাকে, আগে এসে তুকতাক সুরু করে দিলে। ছুবলে ছিল বাঁ হাতের কব্জিতে, ঢোলন বাঁধন এঁটেছিল শক্ত, কিন্তু কনুয়ের ওপরে আঁটেনি। শশধর ডাক্তার এসে বললে, ছিছি, ওখানে বাঁধলে কি হয়? কনুয়ের ওপরে বাঁধন দিতে হয়। বলে একটা শক্ত মোটা রবাটের দড়ি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে টেনে লম্বা করে কনুয়ের ওপর পেঁচিয়ে এঁটে দিলে। সত্যি সে কি বজ্র আঁটুনি বাবা, মাংসের মধ্যে ডেবে গিয়ে যেন সেঁটে রইল রবাটের দড়িটা।

: তুমি দেখেছ?

: দেখেছি বৈ কি। দায়ে ঠেকে সোনারপুর মামাবাড়ী গেছলাম, মনে নাই তোর? রতন কাকা যেবার জেলে গেল?

: হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে।

রাগ কমিয়ে রেবতীকে খুসী করার জন্যই যেন রসিয়ে বাড়িয়ে কাহিনীটা শোনায় অর্জুন, রেবতীকে একটু ভড়কে দেওয়াই যদিও তার আসল উদ্দেশ্য।

: তারপর পৌঁছল দীনু কবরেজের ছেলে সূর্য্যো সেন শর্মা—যার ওই দন্তরুচি কৌমুদী দাঁতের মাজনটা ইষ্টিসনে গাঁয়ে গাঁয়ে খুব ফিরি হচ্ছে। দাঁত মেজে দেখেছি এক আনায় প্যাকেট কিনে, ওই নুন কপ্পুর আর নিমের আরকের ব্যাপার। কোনটাতে—

রেবতী অধীর হয়ে বলে, সাপের কামড়ের কথাটাই বলো না? বিষ্টু মহাজনের ছেলেটা তো মরে নি?

তার অধীরতায় খুসী হয়ে অর্জুন বলে যায়, ছেলেটা মরল কৈ? মরল তো ঢোলন ওঝা।

বলে সে যেন নিজের মনে কি ভাবতে থাকে। আরও অধীর হয়ে রেবতী বলে, তারপর কি হল বল না?

আরও খুসী হয়ে অর্জুন বলে, সে হল মজার ব্যাপার। শশধর ডাক্তার সূর্য্যো কবরেজ ঢোলন ওঝা তিন জনে হাজির হয়ে ঝগড়া জুড়েছে দেখে বিষ্টু মহাজন কেঁদে ফেললে। বললে, ভগবান কে আমার ছেলেকে বাঁচাতে পারে তা তো জানিনে। এখন আমি করি কি!

রেবতী মুখের রাঙা জল ফেলে দিয়ে একটা ঢোঁক গিলে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

কবিগান গাওয়া চাষা ছাড়া এমন ভাবে কি কেউ বর্ণনা করতে পারে সাধারণ একটা ঘটনা? তারপর কি হল জানবার জন্য রেবতী যেন নিজেকে পর্য্যন্ত ভুলে যায়!

অর্জুন কোঁচার খুঁটে নাক ঝেড়ে বলে, কেঁদে উঠেই বিষ্টু মহাজন করলে কি জান? ব্যাটা কঞ্জুসের কঞ্জুস, ছেলেটাকে পেটে ভরে মাছ দুধ খেতে পর্যন্ত দিত না। উঠে গিয়ে

সিন্দুক খুলে হাজার টাকার একতাড়া নোট এনে ছেলের মাথার কাছে রেখে বললে, যে ওকে বাঁচাবে এ হাজার টাকা তার। তিন জনাই হাত বাড়িয়েছিল, ঢোলন খপ করে আগে তোড়াটা কোমরে গুঁজে ফেললে। বললে কি জানো? হয় তোমার ছেলে বাঁচবে, নয় আমি মরবো।— বলে সে দাঁত দিয়ে কামড়ে খানিকটা মাংস তুলে নিলে যেখানটায় সাপে ছুবলেছিল। তারপর সেখানে মুখ দিয়ে চুষে-চুষে রক্ত টেনে বার করতে লাগল। দু'-তিন জন সাগরেদ সাথে থাকত ঢোলনের। তাদের কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে চোলাই খায় আর বিষ চুষে তোলে।

রেবতীর ঔৎসুক্য যেন হঠাৎ একেবারে ঝিমিয়ে যায়। আর যেন কিছুই তার শুনবার বা জানবার প্রয়োজন নেই।

সে বুঝে গিয়েছে ঢোলন ওঝার চোলাই খেতে খেতে সাপের বিষ চুষে তোলার ব্যাপারটা! কতটা বিষ চুষে তুলে থুথু করে ফেলে না দিয়ে গিলে ফেলছিল, সেটা কি তার খেয়াল ছিল মদ খেতে সুরু করে! মদ সহজ বিষ নয় সাপের বিষের চেয়ে। কোন বিষ কতটা গিলছে কি খেয়াল ছিল ঢোলনের!

আন্দাজ নয়। ডাক্তারের কথা।

রেবতীর জন্যই গোবিন্দ এ যাত্রা বেঁচে গেল। আর অর্জুনের জন্য অনেক কম হল রেবতীর চড়া সাপের বিষ মুখে নেবার দুর্ভোগ। হাসপাতালের সহকারী ডাক্তারের নাম সুনীল, প্রৌঢ় বয়স।

তার কাছে জানা গেল, পায়ে সাপ কাটলে হাঁটুর উপর বাঁধন দিতে হয় এটুকু গোবিন্দ জানত কিন্তু বাঁধবার কায়দা জানত না। রেবতীর নতুন শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে বাঁধন দিলেও খুব বেশী কাজ তাতে হয়নি। গায়ের জোরে পাড় পেঁচিয়ে বাঁধলেও ও রকম সাদাসিধে বাঁধনে কি আর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়।

একটু যান্ত্রিক ব্যবস্থাও দরকার। লাঠি ইত্যাদি একটা কিছু যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। বাঁধনের মধ্যে ঢুকিয়ে যতটা সম্ভব পাক দিয়ে আরও শক্ত করতে হয় বাঁধন।

সব শুনে সুনীল ডাক্তার রায় দিয়েছিল স্পষ্ট। রেবতী ও-ভাবে বিষ চুষে না নিলে গোবিন্দের কপালে ছিল নির্ঘাৎ মরণ।

ফোলা মুখের জ্বালা-যন্ত্রণায় কাতর রেবতী কুঞ্জ আর অর্জুনের সঙ্গে হাসপাতালে হাজির হলে সুনীল কিন্তু তাকে বসিয়ে রাখে তিন ঘণ্টা।

অর্জুন বুক ঠুকে একটু চালাকি করে ডাক্তারের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। হাত জোড় করে সবিনয়ে জানিয়েছিল যে সেদিনের সাপে-কাটা মানুষটাকে প্রাণদান করেছিল যে মেয়েটি, ডাক্তারবাবু যার খুব প্রশংসা করেছিল, সেই মেয়েটি এসেছে। ওই সাপের বিষের ক্রিয়াতেই বড় কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটি।

তড়বড় করে কথাগুলি বলে যায় অর্জুন। বলতে বলতে সুনীলের ধমক খেয়ে বেরিয়ে আসে।

সুনীল ধমকে বলে, খুব ভোরে এসে আগে নাম লেখাতে পারেনি?

কুঞ্জ বলে, শোনেনি তোমার কথা, বোঝেনি তুমি কি বলছ। ভারি ব্যস্ত তো। নইলে সেদিন অমন করে বুতির গুণ গাইলেন, বললেন কি এরকম মেয়েকে সরকারী পুরস্কার দেওয়া উচিত, মিটিং করে সম্মান দেওয়া উচিত। সেই মেয়েটা হাসপাতালে এসেছে শুনেও কি এরকম করতে পারেন? রোগীর কি ভিড় দেখছ তো। তোমার কথা শুনতেই পাননি।

তাই হবে।

সাতটার আগে এসেছিল, দশটার পর রেবতী ডাক্তার বাবুর কাছে যাবার হুকুম পায়। অর্জুন আরেক বার এই অল্পবয়সী বিশেষ রোগিণীটির বিশেষ কাহিনী বিশদভাবে বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে চুপ করে যায়।

রেবতীর মুখটা ও-রকম বিকৃত হয়ে না থাকলে কি ঘটত অবশ্য বলা যায় না।

সুনীল প্রশ্ন করে, তুমি ওর কে হও ?

: আজ্ঞে, আমি কেউ হই না।

সুনীল কুঞ্জকে প্রায় ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করে, তুমি ?

: আজ্ঞে, আমি ওর বড় ভাই।

: তোমার বাপের সিফিলিস ছিল ?

: আজ্ঞে না।

: কি করে জানলে ছিল না ?

: সিফিলিস কি রোগ জানতে না পারলে বলতে পারছি না ডাক্তারবাবু। বাবার বাতের ব্যামো আছে।

সুনীল কটমট করে তাকায়। একটা ছাপানো ফর্মে ফস-ফস করে একটা প্রেসক্রিপ্‌সন লিখে দেয়। লাল-নীল পেন্সিলের লাল দিক দিয়ে ফর্মের উপরে লিখে দেয় 'রক্ত-পরীক্ষা খুব জরুরী। সিফিলিসগত বিষ হওয়াই সম্ভব।'

চোখ পাকিয়ে কুঞ্জকে বলে, কলকাতায় ব্লাড পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসবে। এমনি একটা ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি—তিনবার করে খাবে।

অর্জুন প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, কি বলছেন ডাক্তার-বাবু ? সাপের বিষে মেয়েটার মুখ ফুলছে—

সুনীল উদারভাবে হেসে বলে, আমায় হাঁদা পেয়েছিস বাবা ? মুখের মধ্যে সাপের বিষ। সাপটা কামড়েছিল কোথা ?

: আজ্ঞে, ওই যে সেদিন একজন সাপে-কাটা লোককে দেখলেন—অর্জুন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে যেতেই সুনীল তাদের ধমক দিয়ে খেদিয়ে দেয়।

গোবিন্দের কথা তার মনে নেই। তাকে বাঁচাবার জন্য চাষীর ঘরের অজানা একটি মেয়েকে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল তাও সে ভুলে গেছে।

গরীব-মহলে হাসপাতালটার এ বদনাম আছে। মাঝে মাঝে অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে এক রোগে মর-মর রোগী আরেক রোগের ইনজেক্‌সন লাভ করে বসে।

অর্জুনের অনেক দায়।

দায় সামলাতে হিমসিম খেয়ে যায়।

তবু সে গাঁটের পয়সা খরচ করে গঙ্গাধর ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে রেবতীকে খেতে দেয়।

সত্যই সে ওষুধে আশ্চর্য ফল দেখা যায়।

কত চালাক হয়ে উঠেছে যোয়ান চাষা অর্জুন!

গঙ্গাধর ডাক্তারের কাছে সে রেবতীর নাম পর্য্যন্ত বলে না।

সাপের নামও না।

ভক্তি সহকারে প্রণাম করে জানায় যে বিষম তেজী বিষে রক্ত বিগড়ে গেছে একজনার, একটা ব্যবস্থা দিতে হবে।

কল্কেতে তামাক প্রায় নেই বললেই চলে। তবু খানিকক্ষণ হুঁকোটা টেনে গঙ্গাধর বলে, হবে না? যা দিনকাল। খালি কুসংসর্গ, খালি কুসংসর্গ! রক্ত বিগড়ে যাবে না? গোপন রোগ ছাড়া যেন রোগ নেই দেশে। বায়োস্কোপ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে গোপন পাপের ব্যারাম নিয়ে। হুঁকোটা গঙ্গাধর নামিয়ে রাখে প্রায় দেড়শো

বছরের পুরানো একটা দোতলা গর্তকাটা পিঁড়ির কোণার দিকের একটা গর্তে। কাঠের এই দেড়শো বছরের পুরানো বিশেষ কাঠের ধারকটিতে আজও আট রকমের হুঁকো বসানো যায়। হুঁকোর রকমারি শেষ হয়ে গেছে, টিঁকে আছে পুরানো হুঁকো বসাবার ব্যবস্থাটার জের।

: বিড়ি আছে ?

: সিগ্রেট খান।

অর্জুন এক প্যাকেট সস্তা দামের সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। সবাই জানে যে সিগারেটের প্যাকেট পেলে গঙ্গাধর ভারি খুসী হয়।

গঙ্গাধরের ওষুধ খেয়ে আর ওষুধ-গলানো জলে কুলকুচো করে কয়েক দিনের মধ্যেই রেবতীর সমস্ত উপসর্গ দূর হয়।

রেবতীর কৃতজ্ঞতা জানাবার রকমটা অর্জুনের বড়ই খাপ-ছাড়া মনে হয়।

রেবতী সোৎসাহে বলে, তাকেও দিয়ে এসো না ওষুধটা ? পা'টা চটপট সেরে যাবে ?

: ওর পা ভাল হয়ে গেছে। ওর বেলা তো আর পাগলামি করেনি ডাক্তার, ঠিক ওষুধ দিয়েছিল।

রেবতীকে ক্ষুণ্ন মনে হয়।

গোবিন্দের পা ভাল হয়ে গেছে শুনে সে যেন খুসী হয়নি।

বলে, কি রকম লোক বাবা! একবারটি খবর নিতে এল না ?

অর্জুন মুখ বাঁকিয়ে বলে, কারখানার কুলি তো, আর কত হবে ?

কথাটা বিশ্রী দাঁড়ায় বৈ কি।

অমন করে প্রাণে বাঁচিয়ে দিল আর তার কি হল একবার খবর নেবার গরজ হল না মানুষটার ? এমন অকৃতজ্ঞ গোবিন্দ ? এমন ছোটলোক ?

রেবতীর মনটা জ্বালা করবে আশ্চর্য্য কি !

আসলে কিন্তু খবর নিতে গোবিন্দ কসুর করেনি। তবে রেবতীর সেটা জানা ছিল না।

গোবিন্দ খবর নিয়েছে অঘোর আর কুঞ্জর কাছে, অন্তরের সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছে। চিরদিনের জন্য সে ঋণী হয়ে রইল তাদের কাছে, রেবতীর কাছে! শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, চূড়ান্ত প্রশংসা। রেবতীর মত মেয়ে নাকি লাখে একটা হয় না।

অঘোর বা কুঞ্জ খুসী হয়নি, ভাল ভাবে কথা বলেনি গোবিন্দের সঙ্গে। রেবতীর খাপছাড়া কাণ্ডে মনে তাদের অসন্তোষই জমা হয়ে ছিল। ভয় ছিল যে কে জানে কিসের থেকে কোথায় গড়াবে ব্যাপার, লোকে কি বলাবলি করবে।

যতই ভাল হয়ে থাক কাজটা, কোন মেয়ে তো করে না এরকম। শুধু এই জন্যই গরীবের ঘরের বাড়ন্ত মেয়ের কাণ্ডটা লোকে ভাল চোখে দেখতে পারে না।

এ ব্যাপারের জের টানতে তাদের ছিল দারুণ অনিচ্ছা, যত তাড়াতাড়ি চাপা পড়ে যায় ততই ভাল। গোবিন্দের

কাছে তারা কৃতজ্ঞতাও চায় না, মেয়ের প্রশংসাও শুনতে চায় না।

গোবিন্দ তাদের অসন্তোষ টের পেয়েছিল। কারণটাও অনুমান করেছিল মোটামুটি। রেবতীকে দেখবার বা তার সঙ্গে কথা বলার প্রসঙ্গই সে তাই তোলেনি।

শুধু একটি অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। সে গরীব মানুষ, বেশী কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু অঘোরের মেয়ে তার প্রাণদান করেছে, এটাই বা সে ভোলে কি করে!

রেবতীর নতুন শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে পায়ে বেঁধেছিল। সে রেবতীকে একটি কাপড় কিনে দিতে চায়।

: প্রাণের ধার তো শোধ হবার নয়। শাড়ীটা নষ্ট করেছি তাই—

অঘোর ধীরে ধীরে বলেছিল, তোমার মাথা খারাপ আছে বাবা!

: কি রকম?

: সে কি আর তুমি বুঝবে? নইলে উপকারের বদলে অপকার করতে চাও? মোর মেয়েরে কাপড় দেবে কি রকম? তোমার সাথে তার সম্পর্কটা কি?—বলতে বলতে অঘোর হাত জোড় করেছিল, কপাল জোরে বিপদ থেকে রেহাই পেয়েছ, দোহাই তোমার, এবার চুকে যেতে দাও।

তাই সই।

গোবিন্দ আর দাঁড়ায়নি।

ক'দিন বাদে শ্যামগড়ের বাজারে কুঞ্জর সঙ্গে তার দেখা। কুঞ্জ গিয়েছিল বেগুন বেচতে। নতুন কচি বেগুন, দর খুব

চড়া। নতুন বেগুন ভাল করে হাটে-বাজারে উঠতে এখনো কিছু দেরী আছে, দরটা চড়াই চলত কিছু দিন। সময় দিলে গাছে আরও বড় হত বেগুনগুলি, ওজন বাড়ত।

নগদ পয়সার তাগিদে তুলে আনতে হয়েছে। সখ করে এত বেশী দামের বেগুন যারা খাবে, বিক্রী শুধু তাদের কাছে।

একপো আধপো বিক্রীই বেশী।

সারা সকালে আধ সের বেগুন কাটেনি। কুঞ্জকে বিকালেও বসতে হয়েছে। অন্য দোকানীকে পাইকারী হারে বেচে দিতে পারত, কিন্তু পয়সা অনেক কম পাবে।

গোবিন্দ বাড়ী ফেরার পথে বাজারে গিয়েছিল তরকারী কিনতে। ষ্টেশন বাজারে তাকে তরকারী কিনে নিয়ে যেতে হয়।

গোবিন্দদের শুধু ধানের চাষ। তাও আবার পরের জমিতে, ভাগে বখরায়।

সামনে দাঁড়িয়ে গোবিন্দ বলেছিল, এই যে! কেমন আছ ভাই? ভাল ত'?

কুঞ্জ হাসেনি। মুখ তুলে চেয়ে মুখ নামিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল, এই আছি।

রেবতীর খবর জিজ্ঞাসা না করেই গোবিন্দ এগিয়ে গিয়েছিল। তার পরেও দু'-একবার অঘোর আর কুঞ্জর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। গোবিন্দ যেচে কথা বলার চেষ্টা করেনি।

দুঃখ বা ক্ষোভ জাগেনি। এটা অবশ্য ওদের বাড়াবাড়ি, কিন্তু কি আর করা যাবে। ওদের বাড়ীর মেয়ে তার প্রাণ

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
4835
LIBRARY.
18.4.58
218

বাঁচিয়েছে এটা ভুললে তো চলবে না। ওরা যদি তাকে এড়িয়ে চলতে চায়, তাই ভাল।

কিন্তু রেবতী তো আর তাকে এড়িয়ে চলতে চায় না। দু'বেলা কখন সে ঘরের-সামনের সড়ক দিয়ে যাতায়াত করে তাও অজানা নয় রেবতীর। তাছাড়া গোবিন্দের অকৃতজ্ঞতার তার গায়েও ধরেছে জ্বালা।

সে কেন রেহাই দেবে গোবিন্দকে ?

একদিন ভোরবেলা তাই রেবতী একেবারে সামনে পড়ে যায়। ঠিক যেন পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

বাঁকা সুরে বলে, তোমার বাড়ী কোন দেশে গো ? সে দেশের লোকেদের বুঝি এমনি ছোট মন হয় ?

গোবিন্দ ভড়কে গিয়ে বলে, কি করলাম আমি ?

: কিছুই করলে না। তাই তো বলছি। একজনা মুখ দিয়ে বিষ টানল, মরল না বাঁচল একটিবার খবর নেবার দরকারটা কি !

খুব ঝাঁঝের সঙ্গে দিব্যি গড়-গড় করে রেবতী কথা বলে। অচেনা অন্য লোকের সঙ্গে পারত না। কিন্তু আলাপ-পরিচয় না হয়েও গোবিন্দ তার ঘনিষ্ঠভাবে জানা-চেনা মানুষ হয়ে গেছে। মুখের বিষের উপসর্গের যন্ত্রণাভোগের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, লোকের মুখে তার জন্য গোবিন্দের বেঁচে যাওয়ার কথা শুনতে শুনতে হয়েছে, গোবিন্দের অকৃতজ্ঞতার জন্য জ্বালাবোধ করতে করতে হয়েছে।

গোবিন্দ বলে, খবর নিয়েছি বৈ কি। তোমার বাপ-দাদার কাছে খবর নিয়েছি।

শুনে রেবতী নরম হয়, কিন্তু নিবে যায় না। জিজ্ঞাসা করে, আমায় ডাকোনি যে ?

: তোমার বাপ-দাদা পছন্দ করবে না, তাই।

গোবিন্দের যাবার সময় এখন ভোরের আলো আরও কম ফোটে। আজ আবার কিছু কিছু কুয়াশাও হয়েছে। সামনাসামনি দাঁড়িয়েও তারা খানিকটা আবছা হয়েছিল পরস্পরের কাছে। সত্য কথা বলতে কি, রেবতী অনেকটা আন্দাজেই পথ আটকেছিল গোবিন্দের।

মুখোমুখি পথ আটকে তাকে অন্য মানুষ বলে চিনতে পারলেই অবশ্য চোখের পলকে তার কুয়াশায় মিলিয়ে যাবার সুযোগ ছিল। সে ভেবেও রেখেছিল তাই।

গোবিন্দ হঠাৎ প্রশ্ন করে, কপালকুণ্ডলার গল্প জানো ?

: শুনিনি তো। বল না শুনি ?

গোবিন্দ সিনেমার মারফতে গল্পটা জেনেছিল। প্রশ্ন করে সে পড়ে মুস্কিলে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন রেবতীকে কাহিনীটা শোনাবার মত সময় তার নেই। অগত্যা সে বলে সে একটা মেয়ের গল্প, একজনের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

শুনে রেবতীর কৌতূহল যায় বেড়ে।

: সাপে-কাটা থেকে ?

: না, সে অন্য গল্প।

: বলই না শুনি ?

: আজ সময় হবে না গো, ওদিকে কলের ভোঁ বেজে যাবে। কাল নয় খানিক আগে বেরোব, কাল শুনো। ঘুম ভাঙ্গবে তো ?

রেবতী দ্বিধার সঙ্গে বলে, ঘুম নয় ভাঙবে, আরও আগে যে রাত রয়ে যাবে। ভয় করবে না ?

গোবিন্দ এক মুহূর্ত ভেবে বলে, ঘর থেকে ইদিক পানে চেয়ে থেকো, বেরিও না। এখেনে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরাব, তখন বেরিও।

গোবিন্দ চলে যাবার পর রেবতীর মনে একটু আপশোষ জাগে। সে যে পাড় ছেঁড়া শাড়ীটা পড়ে আছে এটা নজরে পড়ল না গোবিন্দের ?

৩

বাড়ীর লোকেরা মনে-প্রাণে চেয়েছিল ঘটনাটা চাপা পড়ে যাক, মানুষ একেবারে ভুলে যাক ঘটনাটা।

মেয়েটার ধিঙ্গিপনার নিন্দা কেউ কেউ করেছে কিছুটা। কিন্তু প্রশংসাই রটেছে বেশী। এতে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেও কামনা করেছে ব্যাপারটা পুরানো হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে তলিয়ে যাক—কেউ যেন এ ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে।

তাই হয়তো যেত।

কিন্তু দিনকাল কিনা গিয়েছে বদলে। গরীব চাষীর ঘরের তুচ্ছ একটা মেয়ের বীরত্বের কাহিনী মানুষ যেন আর কিছুতেই তুচ্ছ করতে রাজী হয় না।

মাস দেড়েক পরে গোবিন্দদের কারখানায় হল ছোটখাট একটা গোলমাল। ভদ্রাভদ্র গরীবদের পক্ষের একটা কাগজ থেকে খবর জানতে এল একেলে একজন কাঠখোট্টা তরুণ রিপোর্টার। সেই সুবাদে গোবিন্দের সাপে কাটার কাহিনী শুনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করে সেইদিনই হাজির হল অঘোরের ভাঙ্গা বেড়া ঘেরা খড়ো বাড়ীর দরজায়।

খবরের কাগজের লোক! রেবতীর ঢং-করা ধিঙ্গিপনার সব বিবরণ জানতে চায়। পরে এসে রেবতীর ছবি তুলে নিয়ে যাবার কথা বলে।

হায় সব্বোনাশ!

কাঠখোট্টা তরুণ রিপোর্টার কি মিষ্টি হাসিই যে হাসতে পারে। তার ইচ্ছায় যেন জগৎ চলে এমনিভাবে অনায়াসে এমন অভয় দিতে পারে। আর যেমন চালাক তেমনি নরম এবং নাছোড়বান্দা। কিছুতেই যেন পারা যায় না তার সঙ্গে।

রাগ করে ভয় দেখিয়ে লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দেবার কথা বলে, গাল দেয়!

অগত্যা অঘোর কাকুতি মিনতি করে। জাতে সে ব্রাহ্মণ শুনে পায়ে ধরে আবেদন জানাতে যায় মেয়ের কেচ্ছা কাগজে ছাপিয়ে যেন তার সর্ব্বনাশ না করা হয়।

পা থেকে হাত ছাড়িয়ে দু'হাতে তার সেই হাত দু'টি বুকে জড়িয়ে ছলছল চোখে বলে, শোন ভাই বলি। আমি আবার আসব, খবর নিয়ে যাব।—সত্যি তোমাদের ক্ষতি হল নাকি। তোমার যদি ক্ষতি হয়, বিষ খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব।

একটু হাসে, সবল তেজী হাসি,—সাপ তো জুটবে না, সে অনেক হাঙ্গামা। এমনি বিষ কিনে খেয়ে মরবো। বল তো খত লিখে দিচ্ছি।

কুঞ্জ আবার রেগে ওঠে, গালাগালি দেয়। বেরিয়ে না গেলে দা' দিয়ে গলা দু'ফাঁক করবে বলে।

সে নিশ্বাস ফেলে বলে, দা আনো, গলা কাটো। পারবে কি ভাই? পারবে জানলে কি একলা আসতে সাহস পেতাম? কেউ জানে না এ গাঁয়ে এসেছি। মেরে বাঁশ বনে গর্ত্ত করে পুঁতে দাও। কেউ টের পাবে না।

একটু হেসে বলে, শালা হারামজাদা বজ্জাত নচ্ছর,—সব কিছু বলতে পার। তোমার অধিকার আছে। তোমাদের যারা নিকেশ করেছে আমার বাপদাদাও তাদের পক্ষে ছিল বৈকি। তোমরা বাপ তুলে গাল দিলে সইতে হবে।

এরকম মানুষের সঙ্গে পারা যায়? এরকম একটা তুমুল হট্টগোল বাধিয়ে কত ঘরোয়া কথাই যে বার করে নেয় খবরের কাগজের ছোকরাটা।

তবে রেবতীকে কিছুতেই তারা বার করে না তার সম্মুখে।

কান পেতে দাওয়ার কথাবার্তা শুনতে শুনতে এক সময় হঠাৎ যেন সঞ্জীবিত হয়ে আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে রেবতী বাইরে যেতে উদ্যত হয়েছিল, গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসানো সশব্দ এক থাপ্পড় তাকে থামিয়ে দেয়।

সাপের বিষে ফোলা গালটা সবে মাত্র স্বাভাবিক হয়েছিল।

পরেশ, অর্জুন, দিগম্বর আর খ্যাঁদা এসে জোটে একে একে। আলাপ আলোচনার আওয়াজ শুনে তারা আসেনি। সড়ক দিয়ে কতক মানুষ এসেছে গিয়েছে, কেউ তারা টেরও পায়নি যে অঘোরের দাওয়ায় চলছে একটা প্রচণ্ড সংঘাত। কি অসাধারণ প্রতিভা খবরের কাগজের রিপোর্টার ছোকরা-টার। কুঞ্জ তাকে গালাগালি দিয়ে হম্বিতম্বি করেছে—পথ দিয়ে গাঁয়ের মানুষ যেতে যেতে শুনে ভেবেছে এ তার নিত্যকারের বৌ ছেলে বাপ মা ভাই বোনের উপর হম্বিতম্বি।

অর্জুনেরা ক'জন আওয়াজ শুনে আসেনি, এসেছে

বাচ্চাদের কাছে খবর শুনে যে অজানা একজন লোক এসেছে, একটা গোলমাল চলেছে অঘোরের দাওয়ায়।

তারা এসে দল ভারি করায় অঘোর বা কুঞ্জ বিশেষ খুসী হয়েছে মনে হয় না। খবরের কাগজে রেবতীর নাম ছাপা হবার আগেই এবার গাঁয়ে রটে যাবে খবরের কাগজের লোক আসার খবরটা।

নাঃ, মুখপুড়ী মেয়ের কেচ্ছা ঠেকানো অসম্ভব।

পরেশ শুধায়, ব্যাপার কি খুড়ো?

জবাব দেয় আগন্তুক।

বলে, আমার নাম কুমারেশ ধর। খপরের কাগজ থেকে আসছি।

কুঞ্জ গোমড়া মুখে বলে, রেবতীর নাম কাগজে ছাপিয়ে দেবে বলছে।

অর্জুন গর্জন করে ওঠে, খবর্দার, ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি।

কুমারেশ হেসে বলে, ও বাবা, তোমার মেজাজ দেখছি আরও গরম!

ধীরে ধীরে সে গা তোলে, অঘোরকে বলে, ভেবো না। সে দিনকাল কি আছে? দেখো, সবাই ধন্য ধন্য করবে তোমার মেয়েকে!

অর্জুন তার পথ আটকায়।

বলে, না, ওসব ছাপতে পারবে না।

কুমারেশ বলে, কি করে ঠেকাবে? হয় আমাকে গুম করতে হয়, নয় খুন করতে হয়। মারধোর করতে চাও,

বলব যে ছাপব না। তারপর গিয়ে ছেপে দিলে আমার কি করবে ?

অঘোর সখেদে বলে, যেতে দে অর্জুন। যা হবার হবে, করব কি। মেয়েটাকেই খেদিয়ে দেব ঘর থেকে।

কি কাণ্ড যে এবার হবে ভেবে তার মাথা ঘুরে যায়।

হয় অনেক কিছুই।

সেটা এমন কিছু যে গাঁয়ের লোকেরও তাক লেগে যায়। রেবতী প্রায় হয়ে যায় দিশেহারা।

আরও অনেকের মতই কাগজে রেবতীর কাহিনী চোখে পড়ে খগেন রায়ের। পড়েই তার মনে হয় এ মেয়েটিকে প্রকাশ্য সভায় সম্মান ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

চাষীদের সঙ্গে তার অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা। কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েকবার খেটেছে। সদরে বাস করে, পেশা ওকালতি। এমনিতে সাদাসিদে শান্ত প্রকৃতির মানুষ, তাই সময় বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে তার তেজ আর মেজাজ দেখে লোকে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এ এলাকার চাষী মহলে তার প্রভাব খুব জোরালো।

খগেন বলে, ফসল ভাগের লড়ায়ে চাষীর মেয়ে বৌ অনেকে নেমেছে, জেলে গেছে, প্রাণ দিয়েছে। তাদের জন্য সভা করেছি। একেও তুলে ধরতে হবে সবার সামনে। অনেকে মানতে পারে না। খাঁটি গেরস্ত মেয়ে বৌ লড়ায়ে নেমেছে, মোটে তারা পেশাদার নয়। ভাবে, কি করে হবে ? এদেশের ভীরু লাজুক গেঁয়ো মেয়ে বৌয়ের পক্ষে তা কি

সম্ভব? দেশের অবলাদের কত সাহস খবর রাখে না তাই বুলি কপচায়। নিজে থেকে বুদ্ধি করে সাহস করে এইটুকু কচি মেয়ে যদি একটা মানুষকে বাঁচাতে সাপের বিষ গিলতে পারে সুযোগ পেলে এ না পারে কি? এরা ধরে রেখেছে, এদেশে মহাদেবেরাই শুধু নীলকণ্ঠ হতে পারেন, মেয়েরা শুধু হতে পারেন মোহিনীর দল। এ মেয়েটি নীলকণ্ঠী হয়ে তার জবাব দিয়েছে।

সঙ্গী সাথী আত্মীয় বন্ধুদের কাছে কয়েকদিন মোটামুটি এমনিভাবে কথা বলে তেজপুরের সভাতে প্রায় এইভাবেই খগেন বক্তৃতা দেয়। এ সভার বেশীর ভাগ গেঁয়ো চাষাভুষো মানুষ। হাততালি দিতে জানে না। বসে দাঁড়িয়ে তারা অভিভূত হয়ে শোনে।

নীলকণ্ঠ মহাদেবের সঙ্গে তুলনীয় নীলকণ্ঠী রেবতী।

তাদের গাঁয়ের রেবতী!

তাদের খেয়াল হয়নি এটা?

এত অভিভূত হয়ে শোনে কিন্তু এবার গুঞ্জনধ্বনি ওঠে সারা সভা ছড়িয়ে।

ষষ্ঠীতলায় ফাঁকা মাঠে সভা। চাষের যোগ্য পতিত জমির প্রকাণ্ড মাঠে শ' চারেক মোটে লোক। আত্মীয়বন্ধু ঘনিষ্ঠতমদের ছোট ছোট ভাগেই জমাট হয়েছে সভাটা। সভা সুরু হবার অনেক আগে থেকেই গায়ে গায়ে ঘেঁষা ভাগগুলি বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি আলোচনা চালিয়ে সমগ্রভাবে গুঞ্জরিত করে তুলেছিল সমাবেশটা।

সভা সুরু হবার পর চুপ হয়ে গিয়েছিল সকলে।

এখন আবার সভা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। সভা চলার সময়, স্বয়ং খগেনের বক্তৃতা চলার সময়, যে বক্তৃতা শুনে তারা আধঘণ্টা মুগ্ধ অভিভূত হয়েছিল। এই সভার ব্যবস্থা করতে কুমারেশ পুরো দুটো দিন আদা-নুন খেয়ে কাছাখোলা খাটুনি খেটেছে।

সভার এই ভাব দেখে সে যায় চটে। ভাবে, জোরে একটা ধমক দিলে সবাই ধাতস্থ হবে, অভিভূত হয়ে বক্তৃতা শুনবে।

বাঁশের গড়া মঞ্চ। তক্তপোষও জোটেনি।

বাঁশও আজকাল সস্তা নয়। সহরে অসম্ভব ইঁটের বাড়ী উঠছে। ইঁটের বাড়ী তুলতে কত যে বাঁশের দরকার হয় আশেপাশের চার পাঁচটা গাঁয়ের একমাত্র বংশীধর যেন সেটা টের পেয়েছিল সকলের আগে।

কুঞ্জর সে শ্বশুর হয়। তিন-চার দিন অন্তর চারিদিক থেকে সংগ্রহ করা বাঁশ গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে সে থানার পেটা ঘড়ি অনুসারে প্রায় রাত আড়াইটে-তিনটের সময় রওনা হয়।

সদরের দিকে নয়।

সোজা কলকাতার দিকে।

গেঁয়ো চাষা শ্রোতাদের সভাস্থ ধাতস্থ করার জন্য কুমারেশ উঠে দাঁড়াতেই খগেন তাকে যেন গায়ের জোরেই পিছু হটিয়ে দেয়।

নীচু-গলায় ধমক দিয়ে বলে, বাহাদুরি কোরো না। নেতাগিরি ফলিও না। জানো না বোঝো না, কর্তালি কোরো না। ওরা হৈ-চৈ করছে, করতে দাও। আমি

যা বলছি তাই নিয়ে ওরা হৈ-চৈ করছে—আমাকে হুট্ করার জন্য নয়। এটুকু টের পাও না? আমি যেটুকু বলেছি সেটুকু ওরা বুঝতে চায়। ওদের চেয়ে সৎ মানুষ জগতে নেই। ওরা যেটুকু শুনেছে সেটুকু বুঝে তবে আমার পরের কথা শুনবে। যা বোঝে না তা নিয়ে ওরা কারবার করে না। চাষাভুষো মানুষ তো!

: এরকম হৈ-চৈ করবে?

: করুক না হৈ-চৈ।

: মিটিং পণ্ড করে দেবে?

: করুক না মিটিং পণ্ড। মিটিং তো ওদের।

কুমারেশ ভীষণ চটে যায়। খগেনকে প্রায় আড়াল করে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলে, হট্টগোল কোরো না, সবাই শোনো। প্রচণ্ড চীৎকারে জারি করা হুকুমে সভা গুঞ্জন থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় বলেই কুমারেশের রক্ত টগবগিয়ে ফুটে ওঠে। সে পেরেছে। চার-পাঁচশো চাষী মেয়ে-পুরুষকে সে এক ধমকে দমিয়ে দিতে পেরেছে।

মঞ্চে মা আর মাসীর সঙ্গে ছিল রেবতী—

তার জন্য এত লোকের সভা।

পরে সদরে আরেকটা সভা হবে।

কি ভাববে কি অনুভব করবে রেবতী ঠিক পায় না। অর্থাৎ যেমন এলোমেলো হয়ে থাকে তার চিন্তা তেমনি খিচুড়ি পাকিয়ে থাকে অনুভূতি।

সভা হবে জানার পর ক'দিন কৌতূহল আর ভয়টাই বড় হয়ে ছিল। না জানি কি হবে? কি করবে সবাই তাকে নিয়ে এক মাঠ লোকের সম্মুখে? মূর্ছাটুর্ছা গেলে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না।

খগেন বাবুর মত লোক পিছনে আছে, অনঙ্গ যদু মণ্ডল বেনী ঘোষেরাও আছে—অনেকে বার বার অঘোরকে অভয় ও উৎসাহ দিয়েছে কিন্তু একটা আশঙ্কা কেউ তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

যদি উল্টো হয়? সভা থেকে লোকে যদি টিটকারী দেয়, অপমান করে?

এমনিতে বিব্রত হয়ে থেকেছে ভয় আর দুর্ভাবনায়, তার উপরে কত রকমের কত মানুষ যে বাড়ীতে এসে তাদের একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কত কথা, কত জিজ্ঞাসা, কত রকমের খোঁচা আর ফোঁড়ন কাটা।

গোকুলের পিসী এসে তো যা মুখে এসেছে বলে গালাগালি করে গেছে একঘণ্টা ধরে।

ঘোর কলি! ঘোর কলি! বলে কপাল চাপড়ে হা-হুতাশ করে গেছে বামুনদিদি।

অল্পবয়সী মেয়ে বৌ যারা অনুমতি পেয়ে আর যারা লুকিয়ে এসেছে, তারা প্রায় পাগল করে তুলেছে রেবতীকে। এমনভাবে হাঁ করে শুধু তাকিয়ে থেকেছে কেউ কেউ! তাদের সেই রেবতী, তাকে নিয়ে হবে দশটা গাঁয়ের সভা—চোখ মেলে রেবতীকে গিলতে চেয়ে তারা যেন বুঝতে চেয়েছে, এমন অদ্ভুত ব্যাপার কি করে সম্ভব হয়।

তবু, ভয় ভাবনা কৌতূহল উত্তেজনায় ক'টা দিন যেন কেটে গিয়েছে খাপছাড়া একটা স্বপ্নের মত। আজ সে সত্য সত্যই মঞ্চে সম্মানের আসনে বসে আছে।

এ যেন অন্য রকম আরেকটা স্বপ্ন।

কেউ টিটকারী দেয় না, কোন প্রশ্ন বা প্রতিবাদ জানায় না, সকলে একমনে তার প্রশংসা শোনে, বার বার জোড়া জোড়া চোখ বক্তার দিক থেকে তার দিকে ফিরে আসে।

ওই রকম অভিভূত বিচলিত অবস্থাতেও একটা বিষয়ে খেয়াল করে রেবতী। শুধু তার প্রশংসাকীর্তন নয়, তাকে বড় করা নয়—তার কথা থেকে আসছে দেশের গরীব চাষাভুষো ঘরের মেয়েদের কথা, চাষীদের দুরবস্থার কথা, চাষীর লড়ায়ে মেয়েদের অংশ নেবার কথা। এই জন্যই বুঝি কেউ টিটকারী দিচ্ছে না তাকে।

সভায় গুঞ্জন ওঠার সময়টুকু রেবতী পাশে নিজের মা ও গোবিন্দের মার কথা শোনে।

গোবিন্দের মা গভীর আবেগের সঙ্গে বলে, তবে তো বাছা মেয়ে তোমার সোজা মেয়ে না। মোরা উল্টা বুঝলাম। যা ভাবলাম দোষ, তাই গুণ হয়ে দাঁড়াল তোমার মেয়ের!

রাজু বলে, কি জানি দিদি কি দিনকাল। ফল ভাল হয় তবেই ভাল। আইবুড়োনী মেয়ের ব্যাপার, এই হৈ চৈ কি ভাল? দু'দিন বাদে হুজুগ থামবে, লোকে তখন কি বলবে ভগবান জানে।

গোবিন্দের মা ভরসা দিয়ে বলে, না না, সে ভয় কোরো না। মেয়ে বৌ দোষ করলে পাঁচজনা বিচার করে, লোকে মানে তো সেটা? এত লোক মিলে মেয়ের তোমার গুণ মেনে নিলে দোষ গাইবার সাধ্যি কি আর হবে কারো? ছেলেকে মোর পেরাণ দেছে, মেয়ে তোমার কলির বেউলা!

বুড়ো ক্ষেত্রকে ঠেলেঠুলে তুলে দেওয়া হয় কিছু বলার জন্য।

মানুষটা হাড়ে-মাসে ক্ষেতহীন হদ্দ চাষী, তাতে বয়স গেছে ষাটের কাছে। পাঁচ-দশ জন চাষীর বৈঠকে তার গলা এখনো খুব চড়ে বটে, চাষাড়ে ভাষায় মনের কথা বলতেও পারে স্পষ্ট করে কিন্তু এত লোকের সভায় দাঁড়িয়ে গলাবাজি করা কি তার ক্ষমতায় কুলোয়?

রেবতীর মত মেয়ে হয় না, সে তাদের কিনে রেখেছে, তার ছেলের প্রাণ দিয়েছে—এইটুকু বলতে বলতে বুড়ো কেঁদে ফেলে।

তার দিকে চেয়ে রেবতীর চোখও ছল-ছল হয়ে আসে। বুকের মধ্যে কি একটা ঠেলে উঠতে চায়।

গোবিন্দের কাছে সে শুনেছিল, কাজ নেওয়ার জন্য তার উপর বাড়ীর লোকে তেমন সন্তুষ্ট নয়। কারণ, ভাল কিছুই হয়নি, ওদিকে চাষের রোজগার গেছে কমে। আগে চাষের সময় ক্ষেতে খাটত, অন্য সময় ঠিকে কাজ খুঁজত। এখানে পাকা কাজ পাওয়ায় হয়েছে মুস্কিল—হয় চাষ ছাড়তে হয়, নয় তো সারা বছরের পাকা কাজটা ছাড়তে হয়।

আয়ের দিকে ভাল হয়নি কিন্তু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে অনেক কিছু।

তার বাপের সেটা বড়ই অপছন্দ। ক্ষেত্রকে কেঁদে ফেলতে দেখে রেবতী ভাবে, তাই কখনো হয়। বাপ কখনো ছেলের উপর বিরূপ হতে পারে।

৪

ওই সভাতেই কিন্তু রেবতীকে নিয়ে হৈ-চৈ করার ইতি হয়।

সদরের সভাটা পর্য্যন্ত প্রথমে একবার স্থগিত হয়ে একেবারে বাতিল হয়ে যায়।

রেবতীর আপনজনেরা মনে-প্রাণে যা কামনা করছিল, ঘটনাচক্রে তাই ঘটে যায়।

রেবতীর নাম কাগজে বেরিয়েছে, এই তেজপুরেই প্রকাশ্য একটা সভা হয়ে গেছে তাকে নিয়ে, তবু কোন দিকে এতটুকু ঢি-ঢি পড়ে যায়নি চাষীর ঘরের অকালপুষ্ট এত বড় মেয়েটাকে নিয়ে।

নিন্দে কি আর করেনি কিছু মেয়ে-পুরুষ। বাড়ী বয়ে এসে দু'-চার জন কি আর গায়ে পড়ে শুনিয়ে যায়নি পিত্তি-চটকানো কথা—কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী লোক প্রশংসাই করেছে মেয়েটাকে।

অনেকে নীরব হয়ে থাকলেও তাই নিন্দা চাপা পড়ে গেছে প্রশংসার নীচে।

শুধু তাই নয়।

সোনারপুরের সম্পন্ন চাষী গোবর্দ্ধনের ছেলে মদনের পক্ষ থেকে এসেছে তাদের কল্পনাতীত রকমের মোটা কন্যাপণ ইত্যাদি দিয়ে রেবতীকে বিয়ে করার প্রস্তাব। বুড়ো

গোবর্দ্ধন অবশ্য বাতিল করে দিয়েছে প্রস্তাবটা, আচ্ছা করে শাসনও করে দিয়েছে ছেলেকে। কিন্তু ওই নড়বড়ে দেহ নিয়ে খুক-খুক করে কাসতে কাসতে ক'দিন আর টিঁকবে বুড়ো গোবর্দ্ধন? তাতে আবার ম্যালেরিয়ায় বাঁধা বছুরে রোগী। প্রতি বছর মাস দুই ভোগে।

কাঁপুনি জ্বরের আগামী পালাটা তার সইবে কিনা সে বিষয়ে গাঁয়ের লোকের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মদন পর্য্যন্ত লোক মারফতে জানিয়ে রেখেছে যে বছরখানেকের মধ্যে রেবতীর যেন অন্য কোথাও বিয়ে না দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধনকে নাকি রাজী করানো যাবে। তার সহজ মানে অবশ্য এই যে মদনও বিশ্বাস করে, বছর খানেকের মধ্যে তার বাপের রাজী-নারাজীর প্রশ্নটাই চিরতরে বাতিল হয়ে যাবে।

তবু রেবতীর আপনজনেরা চাইছিল তাকে নিয়ে হৈ-চৈ বন্ধ হোক, ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাক। লোকের প্রশংসায় অসামান্যা হবার বদলে গরীব চাষীর ঘরের অজানা অচেনা তুচ্ছ সাধারণ মেয়ে হয়ে থাক।

অন্য দিকও তো আছে।

সভাটা হবার পরেই রেবতীর সঙ্গে ভাব করার ঝোঁকটা যেন চড়-চড় করে চড়ে গিয়েছে বেশ কয়েকটা বখাটে ছোঁড়ার। বখাটে হলেও এবং কুবুদ্ধি টের পাওয়া গেলেও রেবতীকে একলা পেয়ে নাগালটুকু ধরাটা ঠেকানো সম্ভব নয়। দু'-এক জনকে ছাড়া।

জন্ম থেকে গাঁয়ের চেনা জানা ছেলে। কোন ছুতো

ছাড়াই যখন খুশী ঘরের মধ্যে ঢুকে পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে বাচ্চা বয়স থেকে পাতানো মাসী পিসী খুড়ি জেঠিদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে রেবতীয় সঙ্গে মিষ্টি আলাপ জুড়লেও বলা যায় না, 'বেরো বখাটে, বেরো বাড়ী থেকে!'

ওৎ পেতে থেকে ঘাটের পথে মাঠের পথে একলা রেবতীর নাগাল ধরে 'কোথা যাচ্ছ ?'—জিজ্ঞাসা করলেও রেবতীর ফুঁসে উঠবার উপায় নেই।

যতক্ষণ না অন্যায় কোন কথা বলছে, হাত ধরার চেষ্টা করছে!

গোমড়া মুখে হলেও রেবতীকে বলতে হবেই, 'ঘাটে যাচ্ছি!'-

তার বাপের জ্বর কেমন, দাদার পেটের অসুখ সেরেছে কিনা, যে আত্মীয় এসেছিল সে আছে না চলে গেছে—এ রকম আরও কয়েকটা কথা বলে তো বটেই, রেবতীকে নিয়ে আবার কোথায় সভা হচ্ছে এ বিষয়েও দু'-চার মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার ওদের অনেকের আছে।

বিষ্টু যখন সাত বছরের কখনো ন্যাংটো আর কখনো নেংটি পরা ছেলে, রেবতী তখন মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল ন্যাংটো হয়ে।

ন্যাংটো রেবতীকে, বালিকা রেবতীকে কি কম পেয়ারা আর আম খাইয়েছে বিষ্টু! সম্প্রতি সে বয়াটে বজ্জাত হয়ে গেছে বলেই দেখা হলে দু'-চার মিনিট কথা না বলে রেবতীর উপায় কি ?

মধু, বংশীরা কয়েক জন এসে অভয় দিয়ে গেছে, ডরিও না জেঠা। ডরালেই পেয়ে বসবে। কুকুরগুলো ঘুর-ঘুর করুক, কুকুর হলেও মানুষ তো, ওটুকু স্বাধীনতা দিতেই হবে। একটু বাড়াবাড়ি করে দেখুক কত ধানে কত চাল!

গাঁয়ের এরা সোনারচাঁদ যোয়ান ছেলে। এদের ভয়েই বখাটেগুলি বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায় না। তবু এদের অভয়দানে একেবারে ভয় কাটে না। রেবতী যদি শক্ত থাকে, তবে অবশ্য কোন ভয় নেই। জন্ম থেকে চেনা-জানা গাঁয়ের ছেলে বলে একটুক্ষণ সাধারণ ঘরোয়া কথা বলার অধিকার আছে বলেই তো আর কোন রকম ইয়ার্কি দেবার হাত ধরবার অধিকার তাদের নেই।

ওরকম বজ্জাতি করতে গেলেই রেবতী যদি চেঁচিয়ে ওঠে, পাঁচজন ছুটে এসে পিটিয়ে দফা নিকেশ করে দেবে পিরীত-কাতুরে বয়াটের। বিষ্টুরাও তা জানে।

কিন্তু কাঁচাবয়সী বাড়ন্ত মেয়ে। বিশেষ দিনে বিশেষ ক্ষণে বিশেষ একজন হাত ধরলে মেয়েটা যদি নরম হয়ে যায়, যদি গলা ফাটিয়ে না চেঁচাতে চায়? শাস্ত্রেই তো বলেছে, পুরুষ হল আগুনের আর মেয়েরা হল ঘিয়ের ভাঁড়।

বয়াটেদের আগুনের তাপ বেশী। কিশোর বয়স থেকে তারা বেপরোয়া বেহিসাবী হয়ে জীবন যৌবন ভবিষ্যৎ দাউ দাউ করে পুড়িয়ে দিতে সুরু করে।

তাই আতঙ্ক।

সিন্দুকে পুরে তালা বন্ধ করে না রাখলে রেবতীকে ওই আগুন থেকে সরিয়ে রাখা যাবে না।

এত বড় মেয়েকে কি দিবারাত্র অন্দরে রাখা যায়? চোখে-চোখে রাখা যায়?

সংসার চলবে কি করে! গা ধুতে শাক ধুতে ঘটি-থালা মেজে আনতে কলসী ভরে জল আনতে এবং আরও অনেক কিছু করতে একলা ঘাটে যেতে দিতেই হবে রেবতীকে।

বিপদ তো শুধু এটাই নয়।

প্রসন্ন বাবুর চাকরাণী ধাই-মা নাম-বিহীনা ভীমের মা ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসে হুকুমজারি করে যায়: বাবুর বাড়ীর মেয়েরা পরদিন দুপুরে রেবতীকে ভোজ খাওয়ার নেমন্তন্ন জানিয়েছে।

প্রসন্ন বাবুর বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ, ভীমের মা'র পঁয়ষট্টি।

হাত-মুখ নেড়ে একগাল হেসে ভীমের মা বলে, কপাল খুলেছে গেছে এ মেয়্যার। বাবু নিজে গিন্নিমাকে বললে, গাঁয়ের সবাই সম্মান করল, তোমরা একদিন খাওয়াবে না মেয়্যাটাকে?

পরদিন ভীমের মায়ের জিম্মাতেই রেবতীকে পাঠাতে হয় নিমন্ত্রণ রাখতে—সঙ্গে যায় পাঁচবছরের মেধো। খেতে বলেছে একা রেবতীকে, বড় কারো সঙ্গে যাওয়া নিয়ম নয়।

প্রথম দিন নির্ভয়েই পাঠিয়েছে। প্রসন্নর মনে যাই থাক, অন্তঃপুরের মেয়েরাই তো রেবতীকে ভোজ খেতে নিমন্ত্রণ করেছে এ ঠাট তাকে বজায় রাখতেই হবে।

মেয়েরা দয়া আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটু সমাদর করবে, খাইয়ে-দাইয়ে তারাই রেবতীকে বিদায় দেবে অবহেলার

সঙ্গে। নিয়মের ব্যাপার। এর মধ্যে আজ শুধু একটু নাক গলাবার বেশী কিছু করার সাহস প্রসন্নর হবে না।

কর্তাব্যক্তির ভারিক্কি ভাব বজায় রেখে সামনে দাঁড়িয়ে সাপের ব্যাপারটা সম্পর্কে ছু'-চার কথা জিজ্ঞাসা করবে, ছু'-একটি মিষ্টি কথা বলবে।

অন্দর গিজ-গিজ করছে মেয়েছেলে। তার মধ্যে বড়-ছোট গিন্নি ছু'জন, নিজের পাঁচটি মেয়ে। কোন রকম ছল-চাতুরীর আড়াল দিয়ে পর্য্যন্ত রেবতীর দিকে থাবা বাড়াবার চেষ্টা প্রসন্ন করবে না।

কিন্তু কে জানে কোথায় গড়াবে খ্যাতিলাভের জন্য তুচ্ছ রেবতীর দিকে প্রসন্নর নজর পড়ার জের!

ভয় না পেলেও সকলের ভাবনা ছিল। যথাসময়ে ভীমের মার সাথেই মেধো আর রেবতীর ভালয় ভালয় ঘরে ফেরায় এ ভাবনাটা দূর হয়। নিশ্চিন্ত অবশ্য তারা হতে পারে না। আসল ছুর্ভাবনাটা তো রয়েই গেল।

রেবতীর মুখে নেমন্তন্ন খাওয়ার এবং প্রসন্নের আচরণের বিবরণ শুনে বরং বেড়েই গেল আশঙ্কা!

অমায়িক ভাবে প্রসন্ন তার সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করেছে, ফিরবার সময় নিজে তার হাতে তুলে দিয়েছে একখানা ভাল কাপড়।

হাসিমুখে বলেছে যে গোবিন্দের পা বাঁধতে তার নতুন কাপড়ের পাড় ছেঁড়া হয়েছিল, তারই ক্ষতিপূরণ করা হল।

ভাল শাড়ী। সর্ব্বদা পরা চলবে না। তবে প্রসন্নর বিবেচনা আছে। এত বেশী ভাল শাড়ী সে রেবতীকে

উপহার দেয়নি যে বিশেষ উপলক্ষে কোথাও যেতে হলেও কাপড়টা তার পক্ষে বেমানান হবে, পরতে তার লজ্জা করবে।

ক্ষতিপূরণ হিসাবে গোবিন্দও কাপড় দিতে চেয়েছিল, সেটা নেওয়া যায় নি। প্রসন্নের উপহার বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করতে হয়েছে।

হয়তো খুশী হয়েই নিয়েছে হাবাগোবা মেয়েটা।

রেবতী সগর্ব্বে বলে, কি সুন্দর ব্যাভার করলে গো মোর সাথে! ঠিক যেন সমান ঘরের মেয়ে গেছি নেমন্তন্নো খেতে।

: মেয়েরা করলে?

: মেয়েদের কেমন মুখ ভার দেখলাম—হিংসে হয়েছে। বাবু খাতির করলে খুব।

রাগে গা জ্বলে যায় সকলের। বাবুর খাতিরে খুসীতে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে! এমন বোকা মেয়ে কি জগতে আছে আরেকটা?

বড় একটা সার্বজনীন ব্যাপারে চাপা পড়ে যায় রেবতীর অসামান্য সাহস দেখাবার ছোট ব্যাপারটা।

জনসাধারণের কাছে তাকে তুলে ধরবার আয়োজন যারা করেছিল তাদের সময় থাকে না তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার। সমস্ত চাষী সমাজের বিষম বিপদের আঞ্চলিক বাস্তবতাটা ফেনিয়ে উথলে ওঠা ঘটনাপুঞ্জের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় একটি চাষীর মেয়ের একদিনের একটু ক্ষণের জন্য একবার অসাধারণ সাহস দেখাবার সাধারণ ঘটনা। চাষীরা সদরে গিয়েছিল শোভাযাত্রা করে, শুধু খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার দাবীটা জোরদার করার জন্য।

শোভাযাত্রার সামনে এগিয়ে ছিল কয়েকজন চাষী মা বৌ মেয়ে।

চাষীর মেয়ে রেবতীর সৎসাহস নিয়ে আরও বেশী হৈ-চৈ হলেও কর্তাব্যক্তিদের আপত্তি ছিল না। আবেদন করলে তারা রেবতীর জন্য একটা মেডেল-ফেডেল দিতেও রাজী হয়ে যেত।

খেতে পাই না, পরতে পাই না বলাটাই অন্যায়। খেতে দাও পরতে দাও দাবী নিয়ে মেয়েদের সামনে রেখে শোভাযাত্রা করে সদরের কর্তার বাড়ীতে চড়াও হতে যাওয়া কত বড় অন্যায় কথা।

কর্তাব্যক্তিটির বাগানের গেট তারা ভাঙ্গবে না, গায়ে আঁচড়ও দেবে না, শুধু খেতে চাই পরতে চাই বলে হৈ-চৈ করবে—তবু কেন এ ভাবে বাড়ীর সামনের রাস্তায় বন্দুক-ধারীদের সাজিয়ে রাখা?

শোভাযাত্রার সামনে ছিল পদ্মা। গুলীতে তার পেট ফুটো হয়ে গেল।

পেটে ছিল মাস পাঁচেকের আগামী দিনের একটা মানুষের সম্ভাবনা। সেটাও চুরমার হয়ে গেল।

তাদের ভয় দেখাবার জন্য হুকুম হয়েছিল ফাঁকা আওয়াজের। তবু কেন গর্ভবতী পদ্মার পেটে আর বুনো সাঁতরার বিধবা মার বুকে গুলী বিঁধল সে রহস্য আর রহস্য নেই সব চেয়ে নিরীহ গোবেচারীর কাছেও।

ভিন্ গাঁয়ের অচেনা অজানা মা বৌ, তবু রেবতীর গা জ্বলে যায় বৈ কি! সেও মনে-প্রাণে চায় বৈ কি যে ওদের নিয়ে প্রচণ্ড রকম হৈ-চৈ হোক।

কিন্তু তার সভাটা বাতিল করার জন্য রাগও রেবতীর হয়।

এমন কোন কথা আছে না কি যে ওদের জন্য সভা শোভাযাত্রা করতে হবে তার সভাটা চাপা পড়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে?

এ কি অন্যায় কথা! এক জনকে আকাশে তুলে এমন ধপাস্ করে ফেলে দেওয়া!

আবছা ভোরে গোবিন্দ গট-গট করে হেঁটে চলে সেই সরকারী সড়ক দিয়ে—সাপ যেন জগতে ওই একটাই ছিল, আরেকটা সাপ কামড়ে দিলেও রেবতীর মত কেউ তার প্রাণ বাঁচালেও কিছুই যেন তার আসে-যায় না!

রেবতী সড়কে নেমে সামনে দাঁড়িয়ে তার পথ আটকায় না। গ্রাম জাগে আবছা ভোরেই। বাড়ীর সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বললে কত জনের নজরে পড়বে কে জানে!

বাড়ীর খানিক তফাতে সাপের আসল আড্ডা বাঁশঝাড়ের আড়ালে থেকে স্পষ্ট গলায় ডাকে, শোন। কথা শুনে যাও।

গোবিন্দ বাঁশঝাড়ের ঘন অন্ধকারে ঢুকে আন্দাজে অদৃশ্য রেবতীর দিকে মুখ করে বলে, চাও নাকি যে আরেকটা সাপে খাক?

ঃ সাপে খেলে মোকে খেত মোকে খাবে। কতক্ষণ ধন্না দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ঠিক নেই। মানুষ এলে আশে পাশে সাপ থাকে?

: মোর কিন্তু ভেঁা বাজবে ছ'টায়।

: একদিন দেরী করে গেলে কি হবে?

: কামাই হবে। পাঁচ মিনিট দেরী হলে আদ্দেক দিন কামাই। দশ মিনিট দেরী হলে একটা দিন কামাই। খাটিয়ে নেবে—না খাটতে চাইলে গেট্ আউট।

: সদরের সভাটা হবে না মোর?

: তোমার সভা?

: মোকে নিয়ে সভা আর কি—যেটা হবার কথা ছিল।

: পদ্মাদের নিয়ে অনেক সভা হবে। ইচ্ছে হলে একটা সভায় গিয়ে বক্তিতা কোরো।

: আঃ, বক্তিতা করতেই যেন চাই। পদ্মাকে শুনছি নাকি ভাড়া করে আনা হয়েছিল সহর থেকে? শোভাযাত্রার সামনে চলার জন্য পঞ্চাশ টাকা ভাড়া ঠিক হয়েছিল?

ভোর হচ্ছে তাড়াতাড়ি। খোলা সড়কে রাত্রি কেটে গিয়ে দিনের আলো খানিকটা স্পষ্ট হয়েছে—সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মানুষ চেনা যায়।

কিন্তু এখানে বাঁশঝাড়ে এই অন্ধকারে পরস্পরকে তারা দেখতে পাচ্ছে না।

গোবিন্দ ছু'পা এগিয়ে যায়। আন্দাজে এদিক-ওদিকে হাত বাড়ায়। কিন্তু বাঁশ আর অন্ধকার হাতড়ে রেবতীর নাগাল পায় না।

সে তখন গম্ভীর কণ্ঠে বলে, পদ্মা আমার বোন হত।

: তোমার বোন?

: মায়ের পেটের বোন নয়। বাবার খুড়তুতো ভায়ের

মেজ ছেলের মেয়ে। আশ্বিন মাসে ওর বোনের বিয়েতে গেছলাম।

: ছি ছি! এমন মিছে কথাও লোকে বলে বেড়ায়! ভাড়া করে আনা মেয়ে!

: দু'-চার জন রটায় এসব কথা—পয়সা পায়। তোমার মত দু'-চার বোকার মনে খটকাও লাগে!

রাগ সামলে রেবতী জোর দিয়ে বলে, আচ্ছা, চালাক চতুর মানুষ এবার কাজে যান। আমি শোভাযাত্রায় যাব, সভায় যাব। বাড়ীতে কেটে ফেললেও যাব।

পদ্মাদের নিয়ে সদরে সভা হবে সতেরোই।

গোবিন্দের কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছে বাড়ীতে মারুক কাটুক, ওই সভায় সে যাবেই। শুধু যোগ দিতে যাবে, আর কিছু নয়। দেখে-শুনে আসবে কি ভাবে এ ব্যাপারে মানুষ প্রতিবাদ জানায়।

কিন্তু মনের কথা মনেই চাপা থাকে তার। সভায় যাবার অনুমতি মিলবে না এটা জানা কথা, তবু মনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করে একচোট ঝগড়া তো করা যেত সকলের সঙ্গে।

কিম্বা কাউকে কিছু না জানিয়ে পরে কপালে কি ঘটবে গ্রাহ্য না করে চলে তো সে যেতে পারে সভায়!

কিন্তু রেবতী জানে সভায় যাবার তার নিজেরই সাধ্য নেই।

যেতে সে পারে।

সত্যিকারের লোহার শিকল দিয়ে তো আর বেঁধে রাখা হয়নি তাকে।

তবু সে শিকলেই বাঁধা। আজ ঝোঁকের মাথায় যে কাজ করে বসবে তার ফলাফলের ভয়-ভাবনা লোহার চেয়ে শক্ত শিকলে বাঁধা।

ক'দিন ধরে চিড়া কোটা হচ্ছে ঘরে। তাকেও মা মাসী পিসীর সঙ্গে ঢেঁকিতে পাড় দিতে হচ্ছে উদয়াস্ত।

রান্নাবান্না নেই।

সাতাশ মণ সিদ্ধ ধানের চিড়ে কোটার ফেলনা ফালতু কুড়িয়েই চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে পেটপূজা। কুড়িয়ে আনা ডালপাতার আঁচে সিদ্ধ করা দুটি-চারটি ভাতের চেয়ে পেটের ভোগ জুটছে ভালই, কিন্তু এটা নিছক সাময়িক ভাল। মাত্র ক'টা দিনের ব্যাপার।

ওই ফেলনা বাড়তি চিড়েই কিছু সঞ্চিত থাকবে ঘরে।

আসল চিড়ে চালান যাবে। একমুঠো আসল চিড়ে জুটবে না তাদের। তাদের শুধু ওই ফেলনা ফালতু দিয়ে, বিচালীর হিসেবে পাওনা নটবরের পাতলা টক দই দিয়ে চিটে গুড়ে মিষ্টি করে দু'বেলা ফলাহার।

কেউ তাকে ঠেকাবে না সে যদি ঘাটে যাবার নাম করে নেমে যায় ওই সরকারী সড়কে। গোবিন্দের মত গট-গট করে হেঁটে যায় ষ্টেশনে—আশেপাশের দশ জন যারা জড়ো হয়েছে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ওরাই টিকিট কাটবে তাকে সদরে পদ্মার শোকসভায় নিয়ে যেতে।

গোবিন্দই হয়তো সব ব্যবস্থা করবে।

দিনান্তে ওরা ফিরবে—পদ্মার জন্য শোকসভা করার জন্য যদি অবশ্য ওদের আটক না করা হয়। আটক করবে না জানা কথাই। একটা মানুষকে আটক করলেই মানুষের ঘাড়ে চাপে সে মানুষটাকে খাওয়ানো-পরানোর দায়। গায়ে-পড়া হাঙ্গামায় যদি দু'-চার দশ জন জেল হাসপাতালেও যায়—বাকী সকলে ফিরিয়ে এনে ঠিকমত তাকে পৌঁছে দেবে তার ঘরের দরজায়।

কিন্তু তার পর ?

বাড়ীর মানুষ গর্জন করে বলবে না এ বাড়ীতে আর তুমি ঢুকো না ? সারা দিন যেখানে ছিলে সেখানে যাও। বলবে, মা বোন মাসী পিসী চিড়ে কুটবে, তুমি যাবে ধিঙ্গিপনা করতে। সারা দিন যেখানে ছিলে সেখানেই থাকো গে' যাও!

সত্যি কথা।

মা বোন মাসী পিসী সবাইকে বাদ দিয়ে, ওদের সবাইকে চিড়ে কোটার জন্য ঢেঁকি পাড় দিতে দিয়ে, একলা সে কোন হিসাবে যাবে ? পদ্মার জন্য তার কি একা শোক ? ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে মা বোন মাসী পিসী কি ভাবছে না পদ্মার কথা, চোখে তাদের জল আসছে না ?

তবু প্রাণ জ্বালা করে। তার অতি বাস্তব সত্যিকারের অক্ষমতা অসহায়তা যেন একটা ফাঁকা অজুহাত। নিজের প্রশংসা কীর্তন শুনতে নিজের সভায় যেতে পারে আর পদ্মাদের জন্য এমন একটা শোকসভায় যেতে একটু বেপরোয়া হয়ে উঠতে সে সাহস পায় না।

সভা করে মানুষ মিছেই তার সাহসের গুণ গেয়েছে! এ বাঁধন আমি ছিড়বই, এ শিকল আমি কাটবই।

রেবতী মনে-মনে গজরায়। সারা দিন খাটে আর জোড়াতালি খাচ্ছে আধপেটা খায়। কাক-ডাকা ভোরে জেগে দীপ-নেবানো আঁধার ঘরে বাড়ন্ত বয়সের ঘুমে নিঃসাড় হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মনে-মনে গজরায়।

কিন্তু নিজের মনে-মনে হলেও এ ভাবে যে গজরায় তার সারা দিনের কথাবার্তা চালচলন কি অগের মত থাকতে পারে!

মেজাজ কি থাকতে পারে ভয়াদি রসে সর্ব্বদাই পাঁকের মত নরম!

আনমনা হয়ে থাকে। হঠাৎ রেগে যায়। কোমরে আঁচল জড়িয়ে কোঁদল করে—ভাবভঙ্গি শাপমণ্যি সব কিছু যেন হয় বুড়ি নাহু পিসীর কোঁদল করার অবিকল নকল।

বড়ই একটা জরুরী ব্যাপারে মেছুনি রম্ভার এ বাড়ীতে আসা দরকার হয়েছিল। সেদিন হাট থেকে ফেরবার পথে না-কথা সুদের হিসাবে শোল মাছটা ফেলে দিতে এসে রেবতীর রকম দেখে রম্ভা থ' বনে যায়।

আর বছর মরিয়া হয়ে এদের ডোবাটা জমা নিয়েছিল—চারা পোণা ছেড়ে দেখবে কি আছে কপালে। দীঘি-পুকুরে ছাড়া পোণা বাড়ার হারকে লজ্জা দিয়েই যেন বড় হচ্ছিল ডোবায় ছাড়া রুই কাৎলা মিরগেলের চারা।

আজকালের মধ্যে জাল ফেলিয়ে বাড়ন্ত পোণার বাড়তি

অংশটা ছেঁকে তুলে নিয়ে সদর বাজারে চালান দেবার কথা ভাবছিল।

এতটুকু ডোবায় তো এতগুলি রুই কাৎলা মিরগেল বড় হতে পারে না। আরও কয়েক বার ছেঁকে তুলে নিতে হবে বাড়তি ছোট মাছ। লোকসান নেই, ছোট পোণারও বাজারে খুচরো দর ন' সিকে আড়াই টাকা সের।

হঠাৎ একদিন দেখা গিয়েছিল সব মাছ মরে গিয়ে ডোবার জলে ভাসছে!

নাঃ, কারো শত্রুতা নয়। কারো মাছ খাওয়ায় উৎকট লোভও এর জন্য দায়ী নয়। এরকম শত্রুতা করার মত শত্রু একজনও নেই রম্ভার। মাছ খেতে না পেয়ে যে পাগল হয়েছে সে-ও ডোবার জলে মাছ মেরে ভাসিয়ে দেবে না।

চুপড়িতে শুধু ওই একটাই শোল মাছ ছিল। গালে হাত দিয়ে রম্ভা খনিকক্ষণ নিজের মায়ের সঙ্গে রেবতীর কোমর বেঁধে কোঁদল করা ত্মাখে।

মজার কোঁদল। ঘাটে যাবে বলে ঘটিটা হাতে নিয়ে রেবতী গিয়েছিল ঘাটে। ঘটিটা দরকার বলে নয়, শুধু মেজে আনবার জন্যে।

গাঁয়ের মেয়েদের ওসব দরকারে ঘটি-ফটি লাগে না। বাঁশবনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ডোবার জলে সর্ব্বাঙ্গ ডুবিয়ে কাজ সারে।

মেয়ে গেছে ঘাটে।

বড় যেন দেরী করছে ঘাট সেরে ফিরতে।

রাজু ঘাটে গিয়ে দেখতে পায় উপুড়-করা ঘটিটা জলে ভাসছে। বাঁশবনটা পাক দিয়ে খুঁজে আসে—রেবতী নেই। এমন কিছু ঘন বাঁশবন নয় যে দিন-দুপুরে অতবড় একটা ধাড়ী মেয়ে চোখে পড়বে না।

কপাল চাপড়ে নারকেল গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরী করা ঘাটে রাজু বসে পড়েছিল।

পিছন থেকে রেবতী এসে জলে নামতে যেতেই শক্ত করে চেপে ধরেছিল চুলের মুঠি।

কোথা গেছিলি রে বজ্জাত ?

আমবাগানে গেছলুম।' বাঁশবনে বড্ড মশা—দু'দণ্ডে গা ফুলিয়ে দেয়। চুল ছেড়ে দে—ছাড় বলছি চুল!

রাজু তার চুল ছেড়ে দিয়েছিল। তারও কি জানতে বাকী আছে বাঁশবনে কিছুক্ষণের মধ্যে কত লাখ মশা দল বেঁধে তেড়ে এসে কামড়ায়।

ঘাটে তখন আর কিছু বলেনি রেবতী। ঘরে ফিরে হঠাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে মার সঙ্গে কোঁদল জুড়েছে।

গালে চড় পড়ে। পিঠে কিল পড়ে। চুল মুঠো করে ধরে তাকে কাবু করার চেষ্টা হয়।

তবু মেয়ে আকাশ ফাটিয়ে গর্জে উঠে উঠে বলে তার যেখানে খুসী সে যাবে, যা খুসী তাই করবে, সবাই তারা চুলোয় যাক।

ক্ষেপেই গেছে মেয়েটা। অগত্যা বাড়ীর মানুষকে রণে ভঙ্গ দিয়ে তাকে নিজের মনে গজরাতে দিতে হয়।

চারুর হাতে শোল মাছটা দিয়ে রাজুকে আড়ালে ডেকে রম্ভা বলে, মেয়াকে কুথাও পাঠাতে পার না ?

কুথা পাঠাব মেয়েকে ?

দূরে কোন আপনজনার বাড়ী পাঠাবে। পাঠিয়ে দিলে ভাল করতে দিদি।

বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে রাজুর।

কি বলছ একটু ভেঙ্গে বল না বাছা ?

রম্ভা মাথা নাড়ে।

ভেঙ্গে বলতে পারব না। বাবু তোমার মেয়েটিকে চায়। প্রথমে ভুলিয়ে ভালিয়ে দেখবে, তার পর জোর করে ছুঁড়িটাকে ভাগিয়ে দাও কোথাও।

তুমি জানলে কি করে ?

তা জানতে চেওনি বাবা, ওসব শুনতে চেওনি। হাবাগোবা নাকি গো তোমরা সবাই ? পেটে বুদ্ধিশুদ্ধির বালাই নাই ? বাবুর নজরে পড়েছে মেয়্যাটা টেরও পাওনি ?

রম্ভা চলে যাওয়ার পর আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হতভম্ব রাজুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় ভীমে মা-র সঙ্গে রম্ভার ঘনিষ্ঠতার কথা। কথাটা সবাই জানে।

রাজু চমকে ওঠে।

কে জানে রেবতীর মন ভাঙ্গাবার জন্য প্রসন্ন রম্ভাকেই কাজে লাগিয়েছে কিনা। মেয়েটার সর্ব্বনাশ করতে চায় না বলে আকারে ইঙ্গিতে বাঁচাবার উপায় জানিয়ে দিয়ে গেল।

অথবা হয়তো তাদের অগোচরে ইতিমধ্যেই অন্য ভাবে সুরু হয়ে গেছে রেবতীর মন ভাঙ্গানোর চেষ্টা, তারই ফলে

এমন খাপছাড়া চাল-চলন হয়েছে মেয়ের, এমন মেজাজ হয়েছে। কথায়-কথায় তেজ দেখাচ্ছে আর যেখানে খুসী যাওয়ার আর যা খুসী করার কথা বলছে।

তাড়াহুড়ো করে রেবতীকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চিড়ে বিক্রীর কয়েকটা টাকাও সঙ্গে দিতে হয় খাই-খরচের জন্য।

মামার বাড়ী ভিন্ গাঁয়ে।

ভিন্ন এক জমিদার গোলোকের এলাকায়। গোলোকের বয়স সত্তর পূরে এল, রাশভারি রকমের ধার্মিক বলে সে শেষ বয়সে চারিদিকে খুব নাম কিনেছে।

কন্তু হায় রে! রেবতীর ভিন্ন জেলায় ভিন্ন জমিদারের ধর্মরাজ্যে মামা-বাড়ীতে পালিয়ে এসে রেহাই পাওয়ার আশা!

যে খবরের কাগজ তাকে খ্যাতি দিয়েছিল সেখানা এখানেও কয়েক কপি বিক্রী হয়। কিন্তু মাসখানেকের পুরানো একটা খবরের স্মৃতির সূত্র ধরে রেবতীকে কেউ আবিষ্কার করে না। তার মামা-মামীই রেবতীর নাম এক রকম প্রচার করেছে, ভুলে যাওয়া খবরটাও আবার অনেকের মনে পড়িয়ে দেয়।

বড়ই গল্পে-মানুষ গোবর্দ্ধন আর গিরি, রেবতীর মামা-মামী।

পুরুষমহলে দু'জনে তারা কত মানুষের নামে বানিয়ে কত গল্পই যে শোনায়! সত্য ঘটনার ভিত্তি পেলে তো কথাই নেই।

অঘোরের বাড়ীতে গিয়ে গোবর্দ্ধনকে সাপে কামড়ানো

আর বিষ চুষে নিতে গিয়ে গিরির মুখ ফুলে ঢোল হয়ে মরার দশা হওয়ার গল্প আজও মানুষকে শোনাতে তারা ব্যাকুল, কিন্তু কেউ শুনতে চায় না বলেই হয়েছে মুস্কিল।

এক কাহিনী কত বার শোনার ধৈর্য্য থাকে মানুষের? সুরু করলেই জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি সব, তুমিই তো বললে সেদিন। খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছ বটে। তা, বিপদ কি এক দিকে এক ভাবেই শুধু আসে? সেদিন কি যে কাণ্ড হল—

কিন্তু রেবতীর কাহিনীটা নতুন, রেবতী সশরীরে গ্রামে এসে হাজির হওয়ায় কাহিনীটা আরও জোরদার হয়েছে। লোকে আগ্রহের সঙ্গে তার কাহিনী শুনতেও চায়, তাকে স্বচক্ষে দেখতেও চায়। এখানে এসেও তাই দেখতে দেখতে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে রেবতীর।

এক গাঁয়ের এক ঘরের কোণা থেকে এসেছে অরেক গাঁয়ের আরেক ঘরের কোণায়—একটু বর্দ্ধিষ্ণু গাঁয়ের একটু সম্পন্ন চাষী মামার বাড়ী।

তাতেই আমাদের রেবতীর কত যেন বেড়ে গেছে ছড়িয়ে গেছে সামাজিকতার দায়।

অচেনা অজানা মানুষগুলিকে সামলানো প্রাণান্তকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় জন্ম থেকে কুঁড়ের কোণে কুণো-করা রেবতীর পক্ষে।

সব বয়সের হরেক রকম মানুষ আসে। দেখতে আসে চাষীর ঘরের সে কেমন মেয়ে, কাগজে যার নাম ছড়ায়।

মেয়েছেলেই অবশ্য আসে বেশীর ভাগ। ঠাকুমা-দিদিমা

থেকে মাসী-পিসীরা, সম্পর্ক পাতাতে দিদি আর বৌদি হতে —সই পাতাতে।

তাদের পরিমাণ সংখ্যার মাপে ধারণা করার সাধ্য রেবতীর নেই।

তার গণনায় মেয়ে ছেলেরা 'এক পাল'।

পুরুষও আসে পনের-বিশ জন।

অধিকাংশ বয়স্ক পুরুষ মানুষ—বৃদ্ধই বলা যায়। কেবল ষাট-সত্তর বছর বয়সের বুড়োই নয়, ও বয়স আর ক'জনের হয় আজকাল, মধ্য যৌবনে প্রৌঢ় বয়সে যারা রোগে শোকে অনাহারে বাহাত্তুরে বুড়োর অবস্থায় পৌঁছেছে তারাই অধিকাংশ। তাদের বাপ খুড়ো জেঠার মত গোবর্দ্ধনের অন্দরে ঢুকে তার বয়স্ক যুবতীর মত বাড়ন্ত বালিকা ভাগ্নীটাকে সামনে ডেকে কথা বলার, স্নেহ জানাবার, তিরস্কার করার অধিকার আছে।

রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় পুরুষও আসে দু'-চার জন।

নামকরা চাষীর মেয়ের মানিয়ে চলার দায়। ওখানে ছিল বেশীর ভাগ আশে-পাশের কম-বেশী জানা-চেনা লোক, এখানে প্রায় সকলেই অজানা।

তাকে জ্বালাতন করতে আসে না। নিছক কৌতূহল মেটাতে আসে না।

প্রাণের তাগিদেই আসে।

খাঁটি চাষীর মেয়েই আছে—অথচ তাকে নিয়ে সভা হয়েছে, খবরের কাগজে নাম ছড়িয়েছে। এ কেমন মেয়ে?

যোয়ানও আসে দু'-এক জন—যাদের অন্দরে আসা,

জাঁকিয়ে বসা, মেয়ে বৌদের সাথে আলাপ করা অনীতি নয়, নতুন নয়।

যোয়ান থেকে প্রৌঢ় বয়সী কয়েক জন পুরুষের কামাতুর নজর কি আর নজরে পড়ে না রেবতীর!

সে তাই আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে একজনও তার সঙ্গে বাড়তি খাতির জমাবার চেষ্টা করতে আসে না। চেষ্টা করার সুযোগ পর্য্যন্ত খোঁজে না।

রেবতী জানে না তার কত সম্মান বেড়েছে। সবাই জেনে গেছে সামাজিক ভাবে সাংসারিক মেলামেশার স্বীকৃত নিয়ম মেনে রেবতীর কাছে ঘেঁষা কঠিন নয়—কিন্তু তার সাথে বাড়তি খাতির জমানো বড় বেশী রকম কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে!

রেবতীর সঙ্গে ছু'দিন একটু খাস্তা পীরিতের সস্তা মজা লুটতে চাইলে অনেক দিন ধরে অনেক রকম ছল-চাতুরী কলা-কৌশলের অভিযান চালাতে হবে। একনিষ্ঠ ভাবে দিনের পর দিন আসা-যাওয়া বজায় রেখে আত্মীয়তা জমাতে হবে। রেবতীর পাঁচ জন আপন জনের সাথে—রেবতীর সাথে এমন ভাবে মিলতে মিশতে কথাবার্তা বলতে হবে যেন সে তুচ্ছ, তার জন্য আসা-যাওয়া নয়। ধীরে ধীরে বিশ্বাস জন্মাতে হবে সকলের মনে যে সকলের আপন হতেই তার আসা যাওয়া, সকলের জন্য তার প্রাণের টানটাই আসল।

তার পর! তার পর তাকে-তাঁকে থাকলে মাঝে-মাঝে জুটবে রেবতীর সঙ্গে একা কথা বলার, মন ভুলিয়ে তাকে বশে আনার চেষ্টা করার কিছু-কিছু সুযোগ।

রীতিমত তপস্যার ব্যাপার।

কী দরকার এত দাম দিয়ে?

সত্যিকারের বাহাত্তুরে বুড়ো বোধ হয় আসে দু'জন।

একজন চরণদাস বাবাজী, আরেক জন যোগীরাজ সাধু।

সত্তর পেরিয়েও বেশ আছে দুজনের স্বাস্থ্য। এক দিনে দু'জনে এসে উপস্থিত অন্য সাত আট জনের সঙ্গে।

একই গ্রামের দু'প্রান্তে ডেরা বেঁধে বসে আজ প্রায় তিন যুগ ধরে চলেছে তাদের শিষ্য বাগানোর লড়াই আর শত্রুতা।

ঠিক শিষ্য বাগানো নয়, কাউকে শিষ্য করার জন্মগত অধিকার যে তাদের একজনেরও নেই, অজ্ঞ মূর্খ চাষা-ভুষো মানুষদের বেলায়ও, তা ভাল করেই জানা আছে।

ভক্ত বাগানোর প্রতিযোগিতা।

রেবতীকে দেখতে এসে একটা খড়ের ঘরে আরও অনেকের মধ্যে দু'জনে একেবারে মুখোমুখি সামনাসামনি পড়ে যাওয়ায় আধ ঘণ্টা গুম খেয়ে থেকে মাঝে মাঝে পরস্পরের দিকে মুখ তুলে এক নজর তাকিয়ে নিয়েই তারা কাটিয়ে দেয়।

আরেক দিন আসবে ঠিক করে দু'জনের একজনেরও বেরিয়ে যাবার উপায় নেই—মানেই দাঁড়াবে হার মানা।

মাথা নীচু করে বসে আছে রেবতী।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে বুড়োর দল।

মাথা না তুলে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্বরে রেবতী জবাব দিয়ে চলেছে।

গ্যাঁট থেকে শুকনো কিছুটা পাতা নিয়ে এক সময় সাধু মুখে গুঁজে দিয়ে চিবোতে থাকে।

চরণদাস ব্যাপার বুঝে ঝোলা থেকে সিগারের মত মোটা একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে প্রাণপণে একটা টান দেয়।

কিছুক্ষণ পরেই তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে।

চরণদাস প্রথম কথা বলে, মেয়েটাকে তো নিকেশ করলে দাদা? চরণদাস উঠে এসে সাধুর পাশে বসে। বলে, এবার খেদাতে হয় সবাইকে। তোমার দাদা গলা আছে, একটা হুঙ্কার ছাড়ো। বুঝিয়ে বললে কেউ বুঝবে না, শুনবে না।

এক মুহূর্ত ভাববারও সময় নেয় না সাধু, হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, মেয়েটাকে তোমরা মারবে নাকি? তাড়াবে নাকি মামাবাড়ী থেকে? এবার সবাই রেহাই দাও ওকে।

ষাট পেরোনো বুড়ো নদেরচাঁদ খসে পড়া কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়াতে জড়াতে সকলের আগে উঠে দাঁড়ায়।

বলে, যা বলেছ দাদা। ভেবেছিলাম, নষ্ট মেয়ে গাঁয়ে এয়েছে গাঁয়ের মেয়ে নষ্ট করতে। আহা, কি মিষ্টি কথা, কি জগদ্ধাত্রীর মত রূপ!

মাথা ন্যাড়া, কঙ্কালের মত চেহারা, যেন তাতে স্পষ্টতর কঙ্কালত্ব পেয়েছে।

পিতল-ওঠা প্লেট-করা ফ্রেমে দুটো মোটা কাচের চশমা চোখে দিয়েও সে ঝাপসা দ্যাখে। চোখ নষ্ট হয় নি—নজর এলিয়ে গুলিয়ে গেছে। লাগসই চশমা পেলে সে তিন হাত তফাতে বসা রেবতীকে মোটামুটি দেখতে পারত,

তাহলে রেবতী কখনোই তার কাছে ঝাপসা আলোয় ঝলসানো জগদ্ধাত্রীর জীয়ন্ত মূর্ত্তি হয়ে উঠত না।

গলায় কাপড় দিয়ে সে রেবতীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।

কয়েক জন হাঁ হাঁ করে ওঠে, কয়েক জন হাসে।

গোবর্দ্ধন ঝেঁঝেঁ উঠে বলে, কাণ্ডজ্ঞানও হারিয়েছে খুড়ো? একটা কচি কাঁচা মেয়ে, তোমার যে পায়ের ধূলো নেবে, তাকে প্রণাম করছ?

নদেরচাঁদ টের পায়, একটা বিভ্রাট বেধে গেছে।

কিন্তু আর তো পিছাবার উপায় নেই।

তাকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নেবে এমন একটা কচি কাঁচা মেয়েকে না বুঝে যদি প্রণাম করে ফেলেই থাকে —সে প্রণাম ফিরিয়ে নিয়ে ভুল স্বীকার করে অপদস্থ হওয়া যায় না সবার কাছে! নদেরচাঁদ হাসে না খ্যাঁক খ্যাঁক করে খেঁকিয়ে ওঠে ঠিক বোঝা যায় না।

তুই সত্যি গোবর্দ্ধন—তোর মাথায় গোবর আছে— সেটাই তোর জ্ঞান বুদ্ধির ধন। কচি-কাঁচা হবে না তো কি জগদ্ধাত্রীর রূপ ফুটবে তোর খুড়ীর মত বুড়ী হাবড়ীতে?

কেউ হাসে না।

নদেরচাঁদের বৌ ফুলের মার চেহারাটা সত্যই বিকট।

বেখাপ্পা গড়ন, বাঁ কাঁধটা নীচের দিকে ঢলে নামানো, বাঁ হাতটা খর্ব আর পঙ্গু—ডান দিকের কাঁধটা আর হাতটা কুস্তিগির পুরুষের মত। মাথাটা একটু লম্বাটে আর বাঁকা, মুখটা তাই ফ্যাদালে মনে হয়—সেই মুখে দু'পাটি বড় বড় দাঁত।

পঞ্চাশ বছর সে ঘর করছে নদেরচাঁদের।

পুকুরে যাওয়া ছাড়া, গরুটাকে মাঠে খুঁটি বেঁধে চরতে দিতে যাওয়া ছাড়া, তিথি আর পূজা-পার্বণে স্থায়ী শিব-মন্দির অস্থায়ী পূজা-মণ্ডপে গিয়ে প্রণাম পূজা জানিয়ে আসতে ছাড়া, সে ঘর ছেড়ে বার হয় না, কারো বাড়ী যায় না, কারো তোয়াক্কা রাখে না। বিশেষ রকম বিপদে পড়লে বরং গাঁয়ের মেয়ে-বৌরাই তার কাছে লুকিয়ে যায়।

ফুলের মা নির্বিকার ভাব নিয়ে বলে, না গো, আমি জানি নে কোন পিতিকার! আমি তো একটা গরু বাছা। মোর কাছে এয়েছিস পিতিকার চাইতে। খাটি-খুটি খাই-দাই-ঘুমোই—জানিও নে বুঝিও নে তোদের ব্যাপার-স্যাপার।

গোপন প্রতিকারের জন্য বিপন্ন হয়ে যারা যায় তারা চুপ করে থাকে মুখখানা কাঁদ' কাঁদ' করে। কেউ কেউ কেঁদেও ফেলে।

ফুলের মা এক হাতে বুড়ো আম গাছের কাটা গুঁড়িটার গা থেকে কুড়োল দিয়ে চুপিয়ে চুপিয়ে চলকা কাঠের ছিলতে তুলতে তুলতে মুখ না ফিরিয়েই বলে, কাঁদিস নে বাছা, ঘরে যা! দেখি কি করা যায়। ফুলকে দিয়ে ডেকে পাঠালে সময় বুঝে সুযোগ বুঝে আসিস।

কত কুমারী আর বিধবাকে সে যে কতকাল ধরে বাঁচিয়ে দিয়ে আসছে সামাজিক সন্ত্রাসবাদের বিপদ থেকে।

নদেরচাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সকলে চলে যায়।

সাধু আর চরণদাস গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জাঁকিয়ে বসে।

কিন্তু হায় রে তাদের হিসাব-নিকাশ।

অন্য সকলে চলে যেতেই রেবতীও উঠে দাঁড়ায়— অন্দরে চলে যাবার জন্য।

সাধু হেঁড়ে গলায় হুকুমের সুরে বলে, একটু বোসো। ক'টা কথা শুধোব তোমায়।

রেবতী কানেও তোলেও না, ফিরেও তাকায় না। ধীর পদে তাদেরই পাশ কাটিয়ে দুয়ার দিয়ে পেরিয়ে মাঠ জমিতে নেমে পাশের হোগলার বেড়ার ফাঁকে বসানো বাঁক দিয়ে অন্দরে চলে যায়।

রক্তের সম্পর্কে যারা নিকট আত্মীয়, তাদেরই কেবল বিনা ঝন্‌ঝাটে বা সামান্য ঝন্‌ঝাটে রেবতীর নাগাল ধরা সম্ভব।

মাসীর ছেলে, মাসতুতো ভাই প্রাণেশ্বর তাই দুপুর বেলা নির্বিবাদে সটান অন্দরে অর্থাৎ তিন ভিটায় খড়ো ঘরের সামনের ছোট অঙ্গনে ঢুকে, বাঘা নামধারী আদ্দেক লোম-ওঠা কুকুরটা ঘেউ করে উঠতেই তাকে ঘরের লোকের মত এক ধমকে বা থামিয়ে দিয়ে, চার-পাঁচ বছর ধরে শূন্য এবং জীর্ণশীর্ণ গোয়াল ঘরটার সামনে কুড়িয়ে অথবা চুরি করে আনা একটা হাত দেড়েক চৌকা ইঁট সিমেণ্টের চাকতিটায় গালে হাত দিয়ে বসা রেবতীকে অনায়াসে বলে, আমায় তুই চিনতে পারবি না রেবতী। কখনো দেখিসনি তো। আমি তোর বড় মাসীর ছোট ছেলে প্রাণেশ্বর।

রেবতী এলোচুলে বসেছিল। রোদে নয়, বাতাসে শুকাচ্ছিল তার তেলের অভাবে আধ রুক্ষ রাশিকৃত চুল।

দেহটা তার নড়ে না, শুধু মুখ তুলে চেয়ে শান্ত মিষ্টি সুরে বলে, বড় মাসীমা মেসোমশায় ভাল আছেন পেরাণদা? তোমায় দেখেই আমি চিনেছি। মনে নেই, ছেলেবেলা রথের মেলায় চলে গিয়েছিলে, দু'-দিনের জন্য গিয়ে দেড় মাস দু'মাস একটানা জ্বরে ভুগে কাটিয়ে এসেছিলে, মোদের প্রায় পাগল করে দিয়েছিলে?

কিছু মনে নেই। কী জ্বরে কত কাল ভুগেছিলাম এতদিন পরে মনে থাকে!

মনে নেই? ওমা, এই তো সেদিনের কথা!

জ্বর আসার পর মাথা বিগড়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলাম। চাষীর ছেলে, বোকা-হাবা, কী ভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে কী কাণ্ড যে করেছিল, তোকে বলতে পারব না। সব যেন কালী পুজোর রাত্রের বাজী ফোটানো, বোমা ফুটানোর ব্যাপার।

আবোল-তাবোল কথা কেন আমায় শোনাচ্ছ পেরাণদা?

প্রাণেশ্বর চটে বলে, আমায় প্রাণেশ্বরদা বলবি। পেরাণ কথাটা আমি পছন্দ করি না।

ইস্কুল-কলেজে পড়েছ বুঝি? তাই এমন কথা! পেরাণদা, মোকে ইস্কুলে-কলেজে একটু পড়াও না গো? একটুখানি জানাও না গো বিনা কষ্টে কিসে মোর পেরাণটা খসে!

মাস্তুতো ভাই! তবু প্রণেশ্বর চলে গেলে রেবতীকে

কড়া ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, তাকে সে যেন বেশী প্রশ্রয় না দেয়।

একদম বিগড়ে গেছে ছোঁড়াটা, চূড়ান্ত রকম বদ হয়ে গেছে। ছোঁড়া সব পারে—ওর অসাধ্য দুষ্কর্ম নেই।

রেবতী তার পোড়া কপালের কথা ভাবে। এমনি কড়া পাহারা যে, ভাল মানুষ, কাজের মানুষ, দামী মানুষ তার কাছে ঘেঁষার চেষ্টাও করবে না। পঙ্গু, অকেজো আর পাজী মানুষরাই শুধু আসবে তার কাছে, আসার অধিকার খাটিয়ে! কোন অপরাধে তার নির্ব্বাসন হল দোষে-গুণে আস্ত শক্ত কাজের মানুষের জগৎ থেকে?

এক চাষাড়ে অন্দর থেকে সে যে প্রায় একই রকম আরেক চাষাড়ে অন্দরে এসেছে এবং এই অন্দরই তার জগৎ এটা খেয়ালও হয় না রেবতীর।

খেয়াল হয় না যে ইতিমধ্যে কতকগুলি বিশেষ ঘটনার বিশেষ অভিজ্ঞতা জুটে না গিয়ে থাকলে মামা-বাড়ী এসে নির্ব্বাসিত বন্দিনীর অনুভূতি জাগা তার হৃদয়মনে একেবারেই সম্ভব হত না।

নিভৃত, নির্জন গোয়ালঘরের উঠান নয়। খড় ঘাসের পচা চালের বাঁশের বেড়ায় এই ঘরগুলি এমন নয় যে সপরিবারে সবাই ঘরের মধ্যে ঘুমোতে পারবে দুপুর বেলা অথবা প্রকৃতপক্ষে বাড়ীটা নির্জন হয়ে থাকবে।

বাড়ীতে মানুষ এগারোটা। মোটে পাঁচজন গেছে মাঠে —বাকী মানুষ ঘরেই আছে।

মামার বাড়ীর আদর!

রেবতী ভাবে হায় রে! সে কালের লেঠেল-রাজা ডাকাত আজ পুলিশ-পোষা চোর হয়েছে। সেই চোরের ভয়ে ছ্যাঁচড়ার মত পালিয়ে আসতে হয়েছে মামা বাড়ী, তবু প্রাণটা মামা-বাড়ীর আদর চায়—খাঁটি আদর।

আদর না ছাই। শুধু অনাদর নেই, দূর-ছাই করা নেই।

তার বাপ-ই তাকে পুষবার খরচ দিচ্ছে তাই নেই।

কিন্তু শাসন আছে, গঞ্জনা আছে।

এলোকেশীর সঙ্গে ভাব হয়েছে তাড়াতাড়ি। ভাগ-চাষী ফণির অল্পবয়সী বৌ এলোকেশী কচি ছুটো ছেলেমেয়ের মা।

বড় গরীব।

যেন কাঙালেরও বাড়া। কে বলবে তারা চাষী, ভাগে হলেও চাষ করে!

ওদের বাঁধা পড়া ভিটের ভাঙা কুড়েয় সন্ধ্যাতক্ কাটিয়ে আসায় কি রাগ মামা-মামীর! রাগের ঝাল মেরে-ধরে গালাগালি দিয়ে ঝাড়তে না পেরে খোঁচা দিয়ে দিয়ে কত কটুক্তি ছ'জনের, মামার কি আপশোষ, মামীর বার বার কি ভাবে নিজের কপাল চাপড়ানো।

কেন, দোষটা কি হল গো? অমন করছ কেন, চ্যাঁচাচ্ছ কেন? এই তো লাগাও ঘরে ছিলাম, বৌটার সাথে ছ'দণ্ড কথা কয়ে এলাম। দোষটা হল কি?'

গাঁয়ে আর বৌ নেই, গল্প করার লোক পেলি না? ওই বজ্জাতটার সাথে কেন তোর এত মাখামাখি? রাত ছুপুরে

পুলিশ এসে মেরে-ধরে সব তচনচ করে দিয়ে গেলে মজা লাগবে, না ?

তবু পূজার কয়েকটা দিন বেশ কাটল রেবতীর।

গোলোক দুর্গাপূজা করে।

আগে গাঁয়ে একটাই দুর্গাপূজা ছিল, গোলোকের তিন মহল বাড়ীর সদর পূজামণ্ডপে—মহাপূজা ছাড়াও সারা বছর ছোট-বড় নানা পূজার জন্য তৈরী সম্মুখ খোলা প্রকাণ্ড তিন দেওয়ালী সরু পাতলা ইটে গাঁথা সুপ্রাচীন ঘর দালান।

আশে পাশের কয়েকটা গাঁয়ের লোকেরা চাঁদা তুলে আরেকটা সার্বজনীন পূজা চালু করেছে বছর কয়েক আগে। এবং কয়েকটা গাঁয়ের লোক চাঁদা দিয়ে থাকলেও সর্বসম্মতিক্রমে গোলোকের পূজা মণ্ডপের সঙ্গে কেবল একটা পাড়ার ফারাক রেখে এই গাঁয়েই পূজা হয়ে আসছে।

দুই পূজায় ঘোরোতর কম্পিটিশন।

গোলোকের সেকেলে পূজামণ্ডপে সেকেলে প্রতিমার সেকেলে পূজার চেয়ে সার্বজনীন পূজার বাঁশ হোগলা ত্রিপলের পূজামণ্ডপে ভিড় হচ্ছে বেশী।

চাঁদা আর প্রণামীতে শুধু পূজার খরচ উঠে যাচ্ছে না—দেড়শো-দুশো টাকা বাড়তি থাকছে! গোড়ায় বছর দুই সকলকে হিসাব অবশ্য দেওয়া হয়েছিল বাড়তিটা বাদ দিয়ে দশ-বিশ টাকা লোকসান দেখিয়ে। লাভটা ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল কয়েক জন মাতব্বরের মধ্যে।

তারপর কয়েক জন বয়স্ক ব্যক্তিকে সামনে খাড়া রেখে ছেলের দল সোরগোল তুলেছিল। মাতব্বরি একেবারে

বাতিল হয়নি, প্রসাদ ইত্যাদি কয়েক জনের বাড়ীতে আজও বেশী পরিমাণে যায়, তবে চাঁদা আর খরচের হিসাব পত্র নিয়ে আর ছ্যাঁচড়ামি চলে না।

পূজার ব্যাপার—মা দুর্গাই হয় তো চটে যাবেন, গোলোক তাই সকলের স্পর্দ্ধাটা সয়ে যায়। অন্য ব্যাপার হলে দু'-চার জনের মাথা যে ফাটত, দু'-একটা ঘরের চালায় যে আগুন লাগত, তাতে সন্দেহ নেই।

রেশারেশির পূজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে সবাই যেন কয়েকটা দিনের জন্য রেবতীকে রেহাই দেয়। গোবিন্দ আসে সপ্তমীর দিন, শেষ বেলায়।

আজ হবে সারা রাত যাত্রা।

রাত ভোর যাত্রা দেখার প্রস্তুতি চলছিল ভিতরে, বাইরে দাওয়ায় বসে বার বার কসতে কসতে থেলো হুঁকোয় দা-কাটা গুড়-মাখা তামাক টানছিল গোবর্দ্ধন।

গোবিন্দ এসে দাওয়ায় উবু হয়ে বসে। গোবর্দ্ধন হুঁকোটা এগিয়ে দিলে ডান হাতের আঙ্গুল আর তালু দিয়ে নল তৈরী করে, হুঁকোর ছাঁদায় সেটা লাগিয়ে কয়েক বার টানে এবং যথারীতি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কাসে। তারপর বলে, রেবতীর মা-বাপের চোখে ক'রাত নিদ নেই—হাড়মাস কালি হয়ে গেছে কদিনে। আমাকে তাই উপায় করতে পাঠাল।

নিয়ে যাবে ?

সার্বজনীন পূজামণ্ডপ চাতালের থেকে আলো ছড়িয়েছে বুড়ো বট গাছটার ডগার দিকে শাখায় পাতায়। সেদিকে তাকিয়ে উন্নাসিক প্রশ্নটা উচ্চারণ করে গোবর্দ্ধন।

গোবিন্দ হাত গুটিয়ে নিয়ে হুঁকোর ছেঁদায় মুখ দিয়ে জোরে টেনে কাসতে কাসতে প্রায় বেদম হয়েও হাসে।

মাথা খারাপ, আমি নিয়ে যাব কি রকম? নিয়ে যেতে আসিনি। কেমন আছে ওর মুখ থেকে জেনে বুঝে যাব—গিয়ে মা-বাপের মন ঠাণ্ডা করব।

গোবর্দ্ধন বলে, অ!

ভিতরে গিয়ে রেবতীকে জিজ্ঞাসা করে, চিনিস তো মানুষটাকে?

রেবতী বলে, ওমা, বাচ্চা বয়েস থেকে ওকে চিনি না?

গোবর্দ্ধন মস্ত একটা হাই তুলে উদাসীনের মত বলে, যা তবে, কথা বলগে যা। ছোট কলকে নিয়ে ঘাটে গিয়ে বসছি—কথা শুনতে পাব না। বাড়াবাড়ি করিস না কিন্তু—মেরে ফেলব, কেটে ফেলব।

ছোট কলকি মানে গাঁজা। ঘাটে বসে গাঁজার কলকেয় টান দিতে দিতে সে চোখ মেলে শুধু দেখতে পারবে তাদের কাণ্ড-কারখানা—তাদের কথাবার্তা শুনতে পাবে না। গেঁয়ো গাঁজাখোর গুরুজনের কি আশ্চর্য উদারতা!

প্রায় আধুনিকতা বলা যায়!

একটানা কত কথাই যে গোবিন্দ বলে যায়। অনেক বার নিশ্বাস টেনেই অবশ্য বলে, এক নিশ্বাসে নয়। অত কথা এক নিশ্বাসে বলতে গেলে সুরুতেই দম আটকে যাবার কথা।

রেবতী চুপচাপ শোনে, মাঝে মাঝে শুধু চোখ তুলে গোবিন্দের মুখের দিকে তাকায়—গায়ে তার কাঁটা দেয়।

কত সুযোগ ছিল তাকে এ সব কথা শোনাবার, কিছুই তখন গোবিন্দ বলে নি। আজ অবেলায় ভিন গাঁয়ে ছুটে এসেছে তাকে কথা শুনিয়ে তার রোমাঞ্চ জাগাতে, তার মাথা গুলিয়ে দিতে।

গোবিন্দ নিজে থেকেই ব্যাখ্যা করে বলে, আগে কিছু টের পাই নি রেবতী, তুমি গাঁয়ে থাকতে একদম টের পাই নি। তুমিও চলে এলে, আমিও আশ্চয্যি বনে গেলাম। প্রাণটা এমন পোড়ায় কেন রে, কার জন্যে পোড়ায়? রেবতীর জন্য নাকি?

আবার গায়ে কাঁটা দেয় রেবতীর।

আরও কতক্ষণ ধরে আরও কত কথা গোবিন্দ শোনাত কে জানে, ওদিকে গোবর্দ্ধনের ঘটে ধৈর্য্যচ্যুতি। উঠে এসে বলে, রাত ভোর কথা চলবে নাকি তুমাদের, এ্যাঁ?

রাত্রে রেবতীর ঘুম আসে না?

গিরি বলে, ঘুমো না বাবা? হাড় জুড়োক। বুড়ী-বুড়ী মাগীদের বাপ-মা বিয়ে দেবে না, মামা-বাড়ী এসে ছটফট করবে রাত ভোর।

এক মামী গত হয়েছে অনেক আগে। তিন নম্বর এই গিরি। দু'নম্বর মামীর এখন মাঝ-বয়স। সে থাকে বাপের বাড়ী। সে নাকি শেষ বিদায় নিয়েছিল এই বলে, সোয়ামীর ঘর করতে করতে বড়জনার মত সোয়ামীর হাতে খুন হয়ে

নরকে যাব—কাজ নেই বাবা। বাপের বাড়ী লাথি-ঝাঁটা খাব, দিবারাত্তির খাটব—সে ঢের ভাল।

দেহগত নড়াচড়ার কাজ করতে, নড়তে চড়তে ঘাটে-বাগানে যেতে, নাতি নাতনিকে ধরতে—এমন কি খেতে বসে ভাগের অন্নটুকু কচুর ঘণ্ট কলমী শাক দিয়ে মেখে মুখে তোলার সময় হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নেবার সময়,—গোবর্দ্ধনের হাত-পা থর থর করে কাঁপে।

বার্দ্ধক্যের মৃত্যু ভারাক্রান্ত বিনিদ্র রাত্রি—ঝিমোতে ঝিমোতেও জীবনের একটু স্বাদের জন্য সে যুবতী গিরিকে পাশে ডাকে! একটু আদর তো করতে পারবে যুবতী বৌটাকে। শুধু একটু আদর!

আদর করার ছোঁয়াছুঁয়িতেই তো জ্যান্ত জীবনের দু'-এক ঝলক শিহরণ বয়ে যাবে দেহে-মনে, মৃত যৌবনের স্মৃতির মত।

গিরি যে কি করে এমন নির্বিকার থাকে, ভাবলেও ঘেন্নায় রেবতীর গা ঘিন-ঘিন করে।

বিয়ে হয়েছে, উপায় নেই, সইতে হবে। সে আলাদা কথা। মুখ-ব্যাজার করতে কি কেউ বারণ করেছে গিরিকে—মাঝে মাঝে কপাল চাপড়ে একটু কেঁদে কপালকে গাল-মন্দ দিতে?

গিরি যে দু'বেলা শুধু আধপেটা শাক-ভাত খাওয়ার সুযোগ পেয়ে গোবর্দ্ধনের তিন নম্বর বৌ হতে খুসীর সঙ্গে রাজী হয়েছিল—সে হিসাব তো রেবতী ধরে নি।

মামা-বাড়ী এসে প্রথম দু'-এক দিনের সামান্য আদরের

পরে সেও খাচ্ছে আধপেটা শাক পাতা কচু—তবু সে গিরির দুঃখ বা আপশোষের এমন অভাব কেন ধরতে পারে না।

সবে শিখেছে নিজের হিসাব করতে। সেও যে মানুষ এই হিসাবটা কষতে।

দুটো সকরুণ মিষ্টি কথা বলে তাকে শাক পাতা কচু আধপেটা খাইয়ে মামা-মামীরা যে তার 'মর্য্যাদা' রাখছে—চাষীর মেয়ে রেবতী হঠাৎ এটা বুঝে উঠতে পারে না।

ওদের তুলনায় কত কম বয়স তিন নম্বর মামী গিরির, কত সে ছেলেমানুষ।

বিয়ে অবশ্য হয়েছে বছর কয়েক আগে, কিন্তু ভরা যৌবন এখনও থৈ-থৈ করছে সর্বাঙ্গে। বিয়ের সময় তো ছিল রেবতীর চেয়েও কচি।

অথচ সে যেন হেসে খেলে মনের আনন্দে ঘর করছে বুড়ো আর জ্বর-জ্বালায় কাতর অশক্ত সোয়ামীর।

এই বয়সে এ রকম সোয়ামির ঘর করাই যেন মজার ব্যাপার।

রেবতীর সঙ্গেই শোয়। তবে অনেক দিন বেশী রাতে ঘুম ভাঙ্গলে পাশ হাতড়ে গিরিকে সে খুঁজে পায় না।

রেবতী এসেছে তার মামা-বাড়ী।

গিরি করছে সোয়ামীর ঘর।

সারা দিন ভর তাকে খাটতে হয়।

শোয়ার পর কথা কইতে কইতে কত তাড়াতাড়িই না গিরির কথা জড়িয়ে আসে দু'-চার বার ছেদ পড়তে পড়তে কথা একেবারে থেমে যায় গাঢ় ঘুমে।

রেবতীর ঘুম আসে না।

গোবৰ্দ্ধন এসে দুর্বল হাতে ঝাঁকানি দিয়ে, কাতুকুতু দিয়ে, কাণে সুড়সুড়ি দিয়ে অনেক কষ্টে গিরির ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে যায়—ঘুমের ভাণ করে রেবতী মরার মত কাঠ হয়ে পড়ে থাকে।

কাক-ডাকা ভোর থেকে দিন-ভোর খাটার পর বিভোর হয়ে ঘুমালেও সে ঘুম ভাঙ্গালে গিরি রাগ করে না, চাপা স্বরে শুধু বলে, বাবা রে বাবা! যাচ্ছি চল।

রেবতী বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে সে গিরিকে একই কথা জিজ্ঞাসা করে, অনেক বছর হয়ে গেছে, এখন মানিয়ে নিয়েছ! মনটা বুড়িয়ে থুরথুরে হয়ে গেছে! বিয়ের সময় মনে কষ্ট হয় নি! বিয়ের পর কষ্ট হয় নি!

কিসের কষ্ট রে?

বুড়ো বর হল বলে?

আ মরণ, ছুড়ির কি কথা! এত ঢং শিখলি কোথা বল দিকি নি? ঘর আছে, জমি আছে, গাই বলদ পুকুর আছে, খেতে দেবে, পরতে দেবে, আদরে-সোহাগে রাখবে, বুড়ো হয়েছে তো হয়েছে কি? কত জোয়ান মদ্দ বৌ নিয়ে উপোস দিচ্ছে দেখতে পাস না?

কিছু বুঝি নে মামী। মাথা ঘুরে যায়।

বোকা তাই বুঝিস নে। বুঝিস নে তাই মাথা ঘুরে যায়। কানু দাস তো যোয়ান মদ্দ, ওর বৌটা কেন গলায় দড়ি দিলে? চারটে ছেলে-মেয়ে ফেলে গলায় দড়ি দিলে!

বড় ছেলেটা মরলে কানু শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়েছিল, মেয়ে দুটোকে কেন মাটিতে গর্ত করে পুঁতে দিলে ?

তাই নাকি গো !

তবে কি ? তিন দিন আগে পরে মরলে মেয়ে দুটো— নিজে কোদাল নিয়ে গর্ত খুঁড়ে পুঁতেছে। পতিত জমিটা করিম মিঞার, সে শুধিয়েছিল—মাটি নিচ্ছ ? মাটি কি হবে ? কানু কি বলেছিল জানিস ? বলেছিল, মাটি নিচ্ছি না, তোমার পোড়ো জমিতে সার দিচ্ছি।

কানু দাসের শোচনীয় কাহিনী অবশ্য ঠিক ভাবে শোনাতে পারে না গিরি—কী করে পারবে।

শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পোড়াবার সাধ্য হারিয়েছে বলে ঘরের পাশের ডাল-কলাই ফলাবার পক্ষে অদ্ভুত উপযোগী আগাছা ভরা অমানবিক ময়লা ভরা পতিত জমিতে গর্ত খুঁড়ে মেয়েটাকে কেন কানুর পুঁততে হল—সে কাহিনীকে রোমাঞ্চকর না করে কত সহজ আর সস্তাই যে করে দেয় গিরি।

বাড়ায় না, ফেনায় না। চাপা গলায় কথা সুরু করেছিল, গলা চড়ে যায়।

বেচারা কি করবে বল ? ওদিকে আরেকটা মেয়ে মর-মর। যেটা মরেছে সেটাকে তাড়াতাড়ি মাটির গর্তে পুঁতে এই মেয়েটার দিকে তাকাবে তো ?

গিরির চোখে জল আসতে চায় কিন্তু প্রাণটা এমন জ্বালা করে যে সেই তাপেই বুঝি জল শুকিয়ে যায় ভিতরেই—চোখটা সজলও হয় না।

শুধু জ্বালা করে।

অকালের বর্ষা নামল মহাষ্টমীর সন্ধ্যায়।

আশ্বিনের প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্গে খানিক বৃষ্টি হয়।

বৃষ্টিটা গৌণ।

ঝড়-বৃষ্টি বলে যে একটা কথার কথা আছে শুধু সেটার মর্য্যাদা রাখার জন্যই যেন আকাশ থেকে কিছু জল ঝরা, বাতাসে ফেনা হয়ে ছড়িয়ে পড়ার জন্য।

তারপর ঝড় থামল, এবার বৃষ্টি।

একটানা বৃষ্টি, অঝোরে, মুষল-ধারে।

সমানে দু'দিন ধরে।

প্রতিবার মহাসমারোহে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয় আধ ক্রোশ দূরের বর্ষা-পুষ্ট শান্ত জীবন্ত নদীতে। এবার নদীই যেন বিসর্জনের প্রতিমা গ্রহণ করতে এগিয়ে এল গাঁয়ের ভিতরে।

এমন বন্যা ক'বছর হয় নি ?

ছ'বছর না সাত বছর।

অসময়ের এমন বন্যা ? এক হাত উঁচু মাটির ভিটে ! ছ'-সাতবছরের গোবর-মাটি লেপায় দু'এক ইঞ্চি কি উঁচু হয় নি আরও ? সেই ভিটের উপর আধ হাত উঁচু জলের বন্যা থই-থই করছে। ধীরে ধীরে জল বেড়ে বন্যা এলে সর্বনাশ হবে না ?

চরম অরাজকতার ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশের মত নদীর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা কত মানুষের সর্ব্বস্ব যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

বাঁধ ভাঙ্গার আওয়াজ শুনে তারা চকিত হয়ে উঠেছিল বটে !

কিন্তু কি করে তারা কল্পনা করবে তাদের এত ঝন্‌ঝাট ঝামেলা বেওয়ারিশ খাটা আর এত লাখ টাকা ঢেলে গড়া বাঁধ এমন ভাবে ভেঙ্গে পড়বে ?

পুরানো আম কাঠের চৌকিটা বন্যার ঘোলা জলের স্রোতের উপর আঙ্গুল চারেক পিঠ উঁচু করে আছে—স্রোতের জল মাঝে মাঝে ঝলক দিয়ে উছলে উঠে ছিটিয়ে পড়ে উপরটা ভিজিয়ে দেয়।

আর আছে ঘরের ভিতরে মানুষ সমান উঁচু মাচাটা। বাঁশের পুরানো নরম মাচা—গোবর্দ্ধনেরই এক বিঘা জমিতে আলু এবং আরেক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করার নতুন পরীক্ষা বুক ঠুকে চালাবার সময় সে মাচাটা তৈরী করেছিল।

নীচে রাখলে ইঁদুর আলু খেয়ে সর্ব্বনাশ করে দেয়, তাই মাচার 'পরে তুলে রাখত।

দু'বছর চেষ্টা করেই গোবর্দ্ধন আলুর চাষ বন্ধ করেছিল—পোষায় না। এত দামে বীজ কিনে, এত মেহনত ঢেলে চাষ করে আলু হয় ডুমুর ফলের মত। জমির যৌবন ফুরিয়ে গেছে। পেঁয়াজও সে মোটে চার-পাঁচ কাঠা জমিতে বোনে।

আলুর চাষ বন্ধ হয়েছে। মাচাটা কিন্তু আছে। চৌকী আর মাচাটা আশ্রয় করে তারা বেঁচে গেছে। বন্যার জলে ডুবে মরেনি।

গরুটা ছিল বাঁধা। বাছুরটা ছাড়া।

বাছুরটাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বন্যা কে জানে। মরা মানুষের সঙ্গে দু'-একটা কুকুর-বিড়ালও ভেসে এসেছে ঘরের দাওয়ায়। বাঁশ দিয়ে ঠেলে দিতে কে জানে কোথায় কোন দিকে ভেসে গেছে।

বাঁধা গরুটা—সকলের আদরের কালোটা—খাটো দড়িতে বাঁধা ছিল বলে বন্যার জলে ডুবে মরেছে।

চৌকিতে বসে কেঁদে কেঁদে গোবর্দ্ধন বলে, একবার খেয়াল হল না গো কালোকে ছেড়ে দেই! কালো মা আমার দড়ির ফাঁসে বন্যায় ডুবে মরছে।

গিরিও কাঁদে।

বলে, আর গরু পুষব না। মা গো মা! দুরন্ত বলে দড়ি বেঁধে রেখে তোকে মুই মারলাম! গো-হত্যা পাতক হল মোর।

বাঁশের মাচায় গিরির পাঁচ বছরের প্যাঁকাটির মত রোগা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসে মামা-মামীর হাহুতাশ কান্নাকাটি শুনতে শুনতে রেবতীর মনে হয় যেন প্রাণান্ত হচ্ছে।

সে রেগে উঠে ঝংকার দিয়ে বলে, কেন গো মামী? নিজেকে দোষী বানিয়ে ন্যাকা কান্না কাঁদছ কেন? গরু সবাই বেঁধে রাখে। এমন বন্যা আসবে তুমি জানতে না অন্যেরা জানত? কালো মরেছে, তোমার দোষটা কি? এ বন্যার দায় যাদের গোহত্যার দায়টা তাদের। তোমার নয়।

গিরি কান্না থামিয়ে হতাশার সুরে বলে, তুই, ছুঁড়ি বুঝবি নে লো, বুঝবি নে। ঘর-সংসার পেতে বসিস, ছেলে-পুলের

সাথে গরু পুষিস, টের পাবি দু'-চারটে ছেলেপিলে পোষার চেয়ে কত হাঙ্গামা একটা গরু পোষায়।

রেবতী এতটুকু দমে না গিয়ে বলে, কি দরকার আমার ছেলে-পিলে পোষায়, গরু পোষায়! গাঙ কি নেই? গাঙে ভাসিয়ে দিলেই চুকে যায়!

যেখানে যত নৌকা আর ডিঙ্গি ছিল সব দিবারাত্রি লেগে যায় প্রাণ বাঁচানো আর প্রাণে বেঁচে থাকার উপকরণ বাঁচানোর কাজে। নৌকাই ঘর-বাড়ী হয়েছে কত পরিবারের। বাঁশ আর তক্তা খাটিয়ে কত পরিবার আশ্রয় নিয়েছে গাছের ডালে।

লক্ষকোটি মানুষের ঘাড় ভাঙ্গার অধিকার পাওয়া কিছু মানুষদের বিলাতী বিশেষজ্ঞ এনে অজস্র টাকা ঢেলে তৈরী করা বাঁধের হঠাৎ চুরমার হয়ে পড়ার বন্যা। সবাই জানত বিপদ আসছে। ভীষণ বিপদ। তাদের কপালে যে এত পরিকল্পনা করা বাঁধ ভাঙ্গার বিপদ এমন আকস্মিক বন্যার রূপ নিয়ে আসবে কে তা ভাবতে পেরেছিল!

জলে থৈ থৈ চারিদিক।

রেবতী ভাবে একটু কিছু যে করত কারও জন্য, তারও তো উপায় নেই!

চারিদিক জলে থৈ থৈ।

গিরি শুধু কপাল চাপড়ে কাঁদে না। ক্রমে ক্রমে রেবতীর খেয়াল হয় মামী যেন কেমন একটা বিদ্বেষভরা ভয়াতুর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে।

রেবতীর মনে হয় গিরির প্রাণে যেন বিরাগ ভাবের বন্যা নেমেছে।

কেন? কেন তার দিকে এমন ভাবে তাকায় গিরি, অথচ রাগ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করে না?

এ সময় কথা কইলে এমন ভাবে মুখ বুঁজে থাকা মনের কথাটা আঁচ করার উপায় থাকে না। গা-বাঁচানো গঞ্জনা বন্ধ হয়েছে।

এমন মুখ ভার করে থাকিসনে মামী। তোর মুখ দেখে সাধ হয়, উঠোনে নেমে ডুবে মরে স্রোতে ভেসে ঘরে তোর চৌকির পায়ার এসে ঠেকি। নয় তো সাঁতরে গিয়ে দেখে আসি বাপ-ভাই ডুবে মরছে নাকি।

গিরি খনখনিয়ে ওঠে, তোদের ওগাঁয়ে জল নেমেছে নাকি? নদীর ওপারে না তোদের গাঁ? ঢল নামলে এপারেই নামে—ওপারে যায় না।

মাচা থেকে নেমে এসে চৌকিতে উবু হয়ে বসে রেবতী রেগে বলে, শোন বলি মামী—বয়েস প্রায় সমান, মাঝে মাঝে তুই বলে কথা কই, সম্পর্কে তো গুরুজন। নে, পায়ে হাত দিয়ে একটা প্রণাম করলাম তোকে? মন খুলে বল দিকি, কেন এমন মুখভার? মোর সাথে কেন কথা কসনে ভাল-মন্দ?

তারে এই আকস্মিক আক্রমণে মনের দুয়ার আর বন্ধ রাখতে পারে না বুড়ো চাষীর সরলা অল্পবয়সী বৌ। দেড় দিনেই দম আটকে আসছিল।

তুই তো ঢল আনলি। একেবারে সব্বোনাশ করলি।

রেবতী গালে হাত দেয়।

ও কি, মামী কি বলছিস তুই? বেশী বর্ষা নামল, নদী ফুলল, বন্যা হল, দায়ি হলাম মুই?

পাপ করে এয়েছিস তো! দু'বছর ঢল নামেনি। পুড়ে-জ্বলে গেছে আদ্দেক ধান। তুই এলি আর ঢল নেমে শেষ করে দিল এবারের চাষ। তোর মামাই তো বললে, সব্বোনাশী মেয়ে এসেছে, এমন ঢল বিশ বছরে নামেনি। এক মণ ধান উঠবে কিনা সন্দ' এবার!

বলতে বলতে কি যেন ঘটে যায় গিরির চেতনায়। জমা করা ভয়-ভাবনার সঙ্গে ভীষণ বন্যার ভয়ঙ্কর ভয়-ভাবনা মিশে ফেটে চুরমার হয়ে যায় তার ধৈর্য্যের ঘাঁটি, চুরমার হয়ে যায় তার সহ্যের বাঁধ।

নেমে আসে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতই বিকারের ঢল।

রকম দেখে রেবতীকে ভাবতে হয়, মাথা কি খারাপ হয়ে গেল গিরির? সে কি ভুলে গেল এইমাত্র তাকে গুরুজন বলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছিল রেবতী?

আছড়ে পড়ে রেবতীর পা জড়িয়ে ধরে গিরি হাউ-হাউ করে কাঁদে, তার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে বলে, তুই ফিরে যা। সব্বোনাশী ফিরিয়ে নিয়ে যা সব্বোনাশ। মাঘ-ফাগুনে বাচ্চা বিয়োতে হবে—মাঠের ধান শেষ হয়ে গেল। কি খেয়ে বাঁচব মাঘ-ফাগুন তক?

রেবতীকে শুয়ে পড়তে হয়। নইলে পা আঁকড়ে ধরা গিরিকে বুকে আঁকড়ে ধরা যায় না। গিরির মাথাটা বুকে চেপে ধরে কানে মুখ লাগিয়ে বলে, কেন এত ভাবছিস মামী? ব্যাকুল হচ্ছিস? তুই মরলে আমি মরলে কার কি এসে

যায়? মরলেই তো তুই-আমি বাঁচি। মরার ভয়ে মরে মরেই তো মোরা ম'লাম।

তার বুকে মাথা গুজে গিরি ফোঁস ফোঁস করে কাঁদে।

কাঁদে আর বলে যে পেট থেকে পড়া মাত্র তার মা-মাগী কেন তাকে মুন দিয়ে মেরে ফেলে নি—মুন তো সস্তা—কত সের আর লাগত আঁতুড়ে তাকে মুন দিয়ে মারতে? বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে যমঘরে পাঠাতে কম কি টাকা লেগেছে মার।

রেবতী বলে, কি ভাবছিস বুঝেছি মামী। সবাইকে ডুবিয়ে নিজে ডুবতে চাস্, মরতে চাস্? এ মরণ কি সুখের হবে তোর? মরে গিয়ে পেত্নী হয়ে ঝাকড় গাছে ঝুলে থাকবি আর মোদের ভয় দেখিয়ে মজা পাবি। কেন গো তোর মরে গিয়ে পেত্নী হওয়ার সাধ? যতক্ষণ বেঁচে আছি, বাঁচার জন্য লড়ব।

গিরি কথা কয় না। হাত দিয়ে পা দিয়ে তাকে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। তার গালে ঘন ঘন চুমো খায়। চুম্বনে আলিঙ্গনে তাকে যেন পিষে ফেলতে চায়।

এখনো উন্মাদিনীর মত করতে থাকলেও তার ভাবান্তরে এতক্ষণে শান্ত হয় রেবতীর মন। সে টের পায়, তাকে মেরে আত্মহত্যার চিন্তাকে গিরি আঁকড়ে থাকবে না, পাগল হয়ে উঠবে না ওই চিন্তায়। গিরি তাকে আদর করছে।

গিরির পাগলামীর এ বিস্ফোরণ বিপজ্জনক নয়।

তৃতীয় দিন জল নেমে যায় দাওয়ার কয়েক আঙ্গুল নীচে। একটু নামবে জানাই ছিল, ঢলের জল চারদিকে

ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু থৈ-থৈ জল সরে গিয়ে উঠোনটার গা তুলতে এবার ক'দিন লাগবে কে জানে!

অতি কষ্টে একটি নৌকা যোগাড় করে আর পাঁচ জনের সঙ্গে গোবর্দ্ধন গিয়েছে জলমগ্ন ক্ষেতের দিকে। কারো কিছু করার নেই। তবু যদি কিছু করা যায়। সর্ব্বনাশ যদি একটু ঠেকানো যায়।

ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে চেরা বাঁশের বৈঠা বেয়ে গোবিন্দ একেবারে দাওয়ায় এসে ঠেকে।

বেড়া ভেসে গেছে বন্যায়। লাউ মাচাটা ভেঙ্গে পড়ে ভেসে গেছে—শিকড়ের বাঁধনে আটক সাদা ফুল আর কচি কচি চারা লাউয়ে ভরপুর গাছটা বন্যার জলে হাবুডুবু খেতে খেতে অঙ্গ খসিয়ে দিচ্ছে।

কুমড়ো গাছটা তুলেছিল চালায়—পুরানো জীর্ণ খড়ের চালায়। গোড়া টেনে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলে দিতে চাচ্ছে হঠাৎ বন্যায় ঘোলা জলের স্রোত, পচা খড়ের চালায় কিন্তু হলুদ ফুল হাসছে, সবুজ চওড়া পাতা, মোটা সোটা সবুজ ডাটা—কচি কচি কয়েক গণ্ডা কুমড়ো ফল।

গোবিন্দ বলে, বেঁচে আছ?—বাঁচলাম। ভাবতে পারিনি এসে জ্যান্ত দেখতে পাব। ফিরে যদি যেতে চাও—

গিরি চীৎকার করে ওঠে, ওকে তুমি নিয়ে যাও—দোহাই তোমার নিয়ে যাও। ওর জন্য এই ঢল নেমেছে—ওর জন্য মোদের এই সব্বোনাশ।

রেবতী রাগে না, আজে-বাজে কথা বলে অবোল-তাবোল মরা-বাঁচার জের টানে না।

সোজাসুজি প্রশ্ন করে, চাল-ডাল ঘাস-পাতা কিছু এনেছ নাকি?

এনেছি বৈ কি।

দাও।

গোবিন্দ এনেছে কিছু মোটা লাল চাল, দু' রকম ডাল, নুন, মশলা কাৎলা মাছের মস্ত একটা মাথা!

রেবতী বলে, মামী, দাওয়ায় একটা উনুন করে চালটা ফুটিয়ে দিচ্ছি, মাথাটা কেটে কুটে দিতে পারবে তো?

গিরি তার দিকে এক নজর তাকিয়েও ছাখে না, বিরাগ-ভরা একটা আওয়াজ করে জানিয়েও দেয় না যে সে তার সব কথাই শুনেছে।

ছেঁড়া কাপড়ের ছেঁড়া আঁচলটা যতটা পারা যায় সামলে সুমলে নিতে নিতে সে উঠে এসে বলে, আমার তরে একজন ডিঙ্গা চেপে দাওয়ায় এসে, ডিঙ্গায় বসে ফিরে যাবে? এতই কি সস্তা হয়ে গেছি মামীশাউড়ী মুই!

ছেঁড়া আঁচলে বুকটাই সামলায় গিরি, কোমরের বাস যে খসে গেছে এটা তার খেয়ালও নেই। গোবিন্দ ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে থাকে তাল গাছটার মাথা অথবা আরও দূরের আকাশে থরে থরে সাজানো মেঘের দিকে। রেবতী লুটানো কাপড় তুলে মামীর কোমরে জড়িয়ে দেয়। খোঁচা দেওয়া রসিকতার সুরে বলে, মামী-শাউড়ী! ভাগ্নী রইল আইবুড়ো, উনি হলেন মামী-শাউড়ী!

গোবিন্দকে বলে, উঠে এসো না দাওয়ায় ? দরদ জানাতে এসে ডিঙ্গায় গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে বৈঠা মেরে মন ফাটিও না আপন জনের।

দাওয়ার খুটিতেই নৌকা বেঁধে গোবিন্দ কাদা-লেপা দাওয়ায় উঠতেই একেবারে যেন অন্য মেয়ে মানুষ হয়ে যায় গিরি।

মুখে বলো আর না বলো, এবার জামাই হয়ে ঘরে উঠলে। কি দিয়ে কি করে জামায়ের মান রাখি!

রেবতী আর গোবিন্দের চোখে চোখ মেলে। দু'জনের চোখ যেন ঝলসে ওঠে।

মাথা কি সত্যি বিগড়ে গেছে গিরির ?

গিরি কি জানে না তাকে জামাই বলা বিষম দোষ ?

ডিঙ্গি নৌকায় চেপে রেবতী বেঁচে আছে না বন্যায় ভেসে গেছে অথবা বন্যায় সব কিছু ভেসে যাওয়ায় না খেয়ে মরতে মরতে বসেছে জানতে এসে সে গিরির কাছে হয়ে গেল জামাই! বিয়ে যেন হয়ে গেছে তাদের!

চাল ডাল নিয়ে সত্যিকারের বুড়ী শাশুড়ীর মতই অনায়াসে কাপড় হাঁটুর উপরেও অনেকখানি তুলে উঠানের থৈ-থৈ জলে নামার আগে মুখ ফিরিয়ে গিরি বলে, না খেয়ে যদি যাও জামাই, আজকেই সম্পর্ক শেষ। তোমার চাল ডাল খড় কঞ্চি জ্বালিয়ে রাঁধছি—মাছের ঝাল পাবে। যেও না কিন্তু, খপর্দ্দার!

রেবতীকে শাসিয়ে বলে, রসুই-ঘরে পা দিবি তো তোর মাথা ফাটিয়ে দোব, হাঁ ? ঘরে যেয়ে গপ্পো কর দু'জনায়।

রসুই ঘরের ভিটে নীচু—এখনো মেঝেয় পায়ের পাতা ডোবানো জল—উনানটা গেছে না আছে কে জানে। রেবতী বলে, রসুই-ঘরে জল যে গো!

গিরি ঝংকার দিয়ে বলে, তোর তাতে কি লো আবাগীর বেটি? আমি যে ভাবে পারি জামাইকে রেঁধে খাওয়াব—দায় তো তোর নয়!

বন্যার ভয়ে উঁচু করে ঘরের ভিত গাঁথা, দাওয়ার কয়েক আঙ্গুল নীচে নামলেও উঠোনে জল কম গভীর নয়। আরও খানিকটা কাপড় উঠিয়ে বন্যার জল ঠেলে গিরি রসুই-ঘরে চলে যায়।

গোবিন্দ বলে, মাছ? মাছের ঝাল?

রেবতী বলে, কেন? বন্যা হলে দাওয়ায় বসে কঞ্চির ছিপে সারা দিন মাছ ধরার ব্যাপার তুমি জানো না?

বলতে বলতে রেবতী হাত বাড়িয়ে আচমকা কঞ্চির ছিপটায় হেঁচকা টান দিয়েই ঢিল দেয়।

বড় মাছ। এ ছিপে তোলা যাবে না।

গোবিন্দ যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া লেগে লাফিয়ে ওঠে।

এক মিনিট শুধু ধরে রাখ মাছটাকে।

তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা খুলে রেবতীর কাঁধে রেখেই গোবিন্দ বন্যার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে—ছিপের সুতোটা ধরে মাছটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ঘর আর বেড়ার কোণার দিকে।

সুতোটা শক্তই ছিল—জালের জন্য পাকানো নতুন সুতো—নইলে মাছটা ধরা যেত না।

বিশ্ব সংসার ভুলে গিয়ে রেবতী চেঁচিয়ে বলে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমিও আসছি।

শুকনো শাড়ী নেই। মামার পরনের আট হাতি ছেঁড়া ধুতিটা সম্বল করেছিল—তাও ভুলে যায় রেবতী। জলে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

দু'হাতের আলিঙ্গনে বুকে বেঁধে প্রকাণ্ড মাছটাকে সত্যই গোবিন্দ তুলে নিয়ে আসে।

মাছটা লেজ চাপ্‌ড়ে চূর্ণ করে দিতে চায় বাঁধন—গামছা-পরা গোবিন্দ দু'হাতে বুকে আঁকড়ে ধরে থাকে মাছটা।

চাপে তার ছাতি ফেটে যাক—এত কষ্টে ধরা মাছটা সে ছাড়বে না।

আট হাতি ছেঁড়া ধুতি পরে রেবতী জলে নেমেছিল সাহায্য করতে।

ছেঁড়া হেটো মোটা ভিজা ধুতিটা রোয়াকে ছেড়ে শুকনো গামছাটা গায়ে জড়াবে বলে ঘরে যাওয়ার উপক্রম করতেই গোবিন্দ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মাছটাকে যেমন ধরেছিল।

রেবতী চাপা গলায় বলে, মাথা খারাপ হয়েছে? মামী তাকিয়ে আছে না রসুই-ঘর থেকে?

এত বড় মাছটা টেনে তোলার উত্তেজনায় গিরির কথা মনেও ছিল না গোবিন্দের।

গিরিকেও আশ্চর্য্য মানুষ বলতে হবে, একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাদের দু'জনের জলে নেমে মাছটা তোলা চেয়ে দেখেছে, টুঁ শব্দটি করে নি।

এ রোয়াকে দু'জনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, রসুই-ঘরের দুয়ারে দাঁড়ানো গিরি মুচকে হেসে বলে, মাছ তো তুললে, মাছ দিয়ে হবে কি জামাই ? পারলে জিইয়ে রাখো, বিয়ের দিন ভোজ দিতে লাগবে। আর নয় তো সহরে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে যাও।

বন্যায় কি শুধু ভেসে যায় মেয়ে পুরুষ শিশুর প্রাণহীন দেহ ? শুধুই কি প্রকাণ্ড মাছ আটকা পড়ে জল থৈ-থৈ করা ছোট উঠানের বাঁশের বেড়ার জেলখানায় ?

ভেসে যায় কিশোর ফসলের আগামী ভবিষ্যৎ।

এই অনিয়মিত এলোমেলো বন্যার রকম-সকম ব্যাপার-স্যাপার আর মারাত্মক ফলাফলের কাণ্ড-কাহিনী যারা জানে তারাই কেবল ধরতে পারে হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ চাষীর মন কি ভাবে হতাশায় কুঁকড়ে যায় সাত দিন দশ দিনের বন্যায় সারা বছরের জীবনের হিসাব-নিকাশ তলিয়ে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়ে !

সকলের ভাব সাব দেখে নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয় রেবতীর।

চিরদিন জানত—পুরুষতায় চরম ভরসা।

পুরুষরা ক্ষেতে খেটে কলে খেটে পয়সা কামায়—তাদের খাওয়ায়।

এবার বিশ্বাস ভেঙ্গে যায় পুরুষের উপর।

গোবিন্দ বলেছে, এই বন্যা নাকি ঠেকানো যায়—ফাঁকি না দিয়ে ঠিকমত বাঁধ গড়া হলে বন্যা এসে সর্ব্বনাশ করে দিয়ে যেত না।

শুধু ঠেকাতে পারাই নাকি নয়। গরু-ছাগলকে বেঁধে পোষ মানিয়ে মানুষ যেমন দুধ আদায় করে খেয়ে বাঁচে আর পুষ্ট হয়, বন্যাকে বেঁধে পোষ মানিয়ে তেমনি নাকি মানুষ বাড়াতে পারে ধনসম্পদ।

কেন তবে বন্যাকে পোষ মানায় না পুরুষেরা? পুরুষ হয়ে নিজেকে ধিক্কার না দিয়ে গোবিন্দ কেন খুসী হয়ে বলে, সে যাই হোক তাই হোক এই বন্যার কল্যাণেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থাটা হয়ে গেল।

বন্যা যদি না হত, সে যদি খবর নিতে না আসত, প্রকাণ্ড মাছটা তোলার আনন্দে আত্মহারা হয়ে রেবতীকে বুকে জড়িয়ে ধরা গিরির চোখে যদি না পড়ত—তবে কি এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা হত?

একি বিচার-বিবেচনা পুরুষের? এই বন্যায় বিয়ে?

তিন দিন পরে যে বিয়ের শুভ লগ্ন আছে সেই লগ্নে?

রেবতী আর গোবিন্দ দু'জনে মিলে মস্ত একটা রুই মাছ রোয়াকে তুলতে গিয়ে অর্দ্ধ নগ্ন হয়ে, মাছটা তুলে রোয়াকে রেখে পরস্পরের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে, একটা অদ্ভুত রহস্যময় অদম্য প্রেরণায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল বলেই এবং সেটা মামীর চোখে পড়েছিল বলেই তিন দিনের মধ্যে বিয়ে ঘটিয়ে দিতেই হবে তাদের! এই থৈ-থৈ বন্যায় পৃথিবী যখন ডুবে আছে!

মামী বলে, না বাছা। সব বুঝেছি—আর টাল-বায়না নয়। বন্যা হোক ভূমিকম্প হোক আর দেরী করা নয়। ছিরিমন্ত ঠাকুর এসে মন্তরটা আউড়ে দিয়ে যাক, দু'পাঁচ জনা

পড়শী এসে দুটো মেঠাই-মণ্ডা খাক, তার পর যা খুশী কর তোমরা দু'জনায়।

রেবতীর বাপ-ভাই ?

গোবিন্দ তাদের খবর দেবে।

মামা বলে, গোবিন্দ রাজী না হলে দা' দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে বেনো জলে ভাসিয়ে দিতাম।

রেবতী মনে মনে হাসে। গোবিন্দ রাজী না হলে! নগদ নগদ হাতে স্বর্গ পাবার জন্য গোবিন্দ রাজী না হলে!

মামা-মামীকে একটু ভড়কে দেবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করে, ছেড়ে তো দিলে, আর যদি ফিরে না আসে ?

মামী হেসে বলে, চুপ কর মুখপুড়ী ছুঁড়ী! খুসীতে গদ গদ হয়ে যায়নি তোর বাপ-ভাইকে খবর দিতে ? কে জানে বাবা তুই কি বজ্জাতি জানিস, কোথা থেকে কি বশীকরণ শিখেছিস! তোর মামা কথাটা তুলতেই বললে কি না, তাই তো আমি চাই, ধন্না দিয়ে আছি, হন্যে হয়ে আছি!

গালটা তার টিপে দেয় মামী।

ধন্যি মেয়ে বাবা তুই!

কি করলাম ? কোন দিন হাত ধরতে দেইনি জানো ? মাছটা তুলতে বেসামাল হয়ে কেমন করে যেন—

মামী পোড়া তামাকের গুঁড়োয় মাজা কালো দাঁতে দু'গাল হেসে বলে, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ। মিটেই তো যাচ্ছে ব্যাপারটা ? এই ঘরে তোর বাসর করে দিয়ে বিয়ের রাতে মোরা ওই চালার নীচের মাচাটায় রাত কাটাব।

মশায় পোকায় অতিষ্ঠ করবে—উপায় কি তুই ছুঁড়ি যে পীরিতের জালে জড়িয়েছিস্।

মামীর হাসি-খুসীর ভাব দেখে পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল রেবতী।

পীরিত করা তবে নিষিদ্ধ নয় তার মত গরীব ছোট লোক চাষীর মেয়ের পক্ষে!

পীরিত করা লোকটার সঙ্গে বিয়েও অসম্ভব নয়—বন্যায় দেশ ভেসে গেলেও!

গোবিন্দ ফিরে আসে না!

কোন সংবাদও জানায় না।

মামা-মামী বিয়ে স্থির করল তৃতীয় দিনের শুভ লগ্নে।

দ্বিতীয় দিনটা কেটে গেল মামীর সনে হাত মিলিয়ে ভাত-ব্যঞ্জন রেঁধে, চিড়ে কুটে, বিচালি টুকরো করে কেটে।

পরদিন গোবিন্দ এসে নিশ্চয় জানিয়ে যাবে ব্যবস্থাটা কি রকম আর কি ভাবে করা হল।

বন্যায় ভাসা পৃথিবীতে শুধু মন্ত্র পড়ে শোয়া হোক, বিয়ে তো তুচ্ছ ব্যাপার নয়!

সারা দিন প্রতীক্ষায় কাটে।

গোবিন্দ আসে না।

বন্যা থৈ-থৈ করছে অঙ্গনে।

দাওয়া বসে উঠোনে ছিপ ফেলে ছেলে-মেয়ে বৌরা ধরছে চারা রুই কাৎলা মিরগেল আর পুঁটি মাছ।

দিন যায়।

রাঙা হয় দিনান্ত। বিয়ের দিনেও গোবিন্দ আসে না।

আসে অজানা একজন যোয়ান মানুষ।

খবর দেয়, গোবিন্দকে বিনা বিচারের আইনে ধরে জেলে পোরা হয়েছে।

কিন্তু এইটুকুর বেশী গোবিন্দের খবর আর কিছুই সে বলতে পারে না।

হাঙ্গামা হয়েছে, ধড়পাকড় চলেছে, অনেকের সঙ্গে জেলে গেছে, এর বেশী আর কোন খবর তার নাকি জানা নেই!

দিব্যি চেহারা। ফর্সা রং, ডাগর চোখ, শান্ত-সৌম্য মুখ। গেঁয়ো ধরণে কদম-ছাঁটা চুল, গায়ে একটা গেঞ্জিও নেই, কিন্তু খালি গায়ে চাপানো সহরের ভদ্র ছাঁটের পাঞ্জাবী।

পাঞ্জাবীর পাতলা কাপড়ের তলায় মোটা পৈতেটা চোখে পড়ে।

গিরি কোমর বেঁধে জেরা সুরু করে দেয়। বলে, আপনি কেমনধারা মানুষ বাবু? ঘরে বয়ে এসে খবর দিলেন ধরে নিয়েছে, আর কিছু জানেন না! নামটা শুনি? কোন্ গাঁয়ে ঘর?

সে একটু হেসে বলে, নাম শুনে কি করবে বল? আমার নাম প্রমথ ভট্টাচার্য্য—বাড়ী তোমাদের পাশের গাঁয়ে—নওপাড়ায়। কত কাদা ঠেলে হেঁটে এসেছি দেখছ না?

সত্যিই তার প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। গিরি যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। মানুষটা এসে যে দাওয়ার সামনে উঠানের কাদায় দাঁড়িয়ে আছে, এতক্ষণে সেটা যেন তার খেয়াল হয়।

কাদা ঠেলে হেঁটে গিয়ে গোলকের বাইরের ইঁদারা থেকে ঘড়া ভরে খাবার জল এনেছিল, তাড়াতাড়ি সেই ঘড়া এনে সে বলে, দাওয়ায় উঠে আসেন ঠাকুর মশায়—পা ধুইয়ে দেব।

প্রমথ বিব্রত ভাবে বলে, কেন বাছা এ সব সুরু করছ? খবরটা শুধু জানাতে এসেছিলাম, আমি এবার বিদায় নেব।

গিরি বলে, তা কি হয় ঠাকুর মশায়? বাড়ী বয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবেন? পা ধুইয়ে দিই, দাওয়ায় উঠে বসুন!

প্রমথ একটু হেঁকে বলে, কি লাভ হবে বল ত? ঘড়ার জলটুকু শুধু নষ্ট হবে। আবার কাদায় পা ডুবিয়েই তো ফিরে যেতে হবে আমায়? তার চেয়ে পা ঝুলিয়ে দাওয়ায় বসছি—কি বলার আছে বল।

পাঞ্জাবীটা উঁচু করে প্রমথ খাঁজকাটা ধাপে পা রেখে দাওয়ায় বসে। গিরি গোমড়া মুখে চেয়ে থাকে।

প্রমথ বলে, নাম-ধাম তো বললাম—চুপ করে আছ কেন? ধাঁধাঁ কিছুই নয়। তিন চার হাত ঘুরে খবরটা আমার কাছে পৌঁছেচে—কারখানায় হাঙ্গামা হয়েছে, এর বেশী ব্যাপার আমিও কিছুই জানি না। আমায় শুধু বলা হয়েছে তোমাদের খবর দিতে যে, গোবিন্দ নামে একজন লোক আটক হয়েছে।

প্রমথ একটু হাসে। ব্যাপার কিছুই জানি না বুঝি না বলেই তো কাদা ঠেলে নিজেকে আসতে হল! নইলে অন্য

কাউকে পাঠিয়ে দিতাম। কি ব্যাপার কে জানে, বেশী জানাজানি হয়ে দরকার নেই ভেবে আমি নিজেই এলাম।

খবর দিয়েছে কে? আপনার কেন এত গরজ খবর দেবার?

আমায় যে বলেছে, তাকে তুমি চিনবে না বাছা! তাকেও দায়টা দিয়েছে আরেক জন। এত গোলমেলে ঠেকছে কেন ব্যাপারটা?

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে প্রমথ এক টুকরো কাগজ বার করে বলে, ক'হাত ঘুরে কাগজটা আমার কাছে এসে ঠেকেছে। এতে শুধু লেখা যে গোবরহাটার গোবর্দ্ধন মালিকের বাড়ীতে রেবতী দাসীকে জানাতে হবে, গোবিন্দ আটক হয়েছে। তোমাদের মধ্যে রেবতী কে বাছা?

রেবতীর দিকে চেয়ে গিরি বলে, এ মেয়েটার সাথে গোবিন্দের বিয়ে হবে ঠিক ছিল।

প্রমথ বলে, অ! তাই খবরটা জানানো এমন জরুরী বলা হয়েছে!

প্রমথ চলে গেলে গিরি রেগে নাক সিঁটকে বলে, সব বজ্জাতি বুদ্ধি। এ্যাতকাল ধরে নি, কুথাও কিছু নেই, বিয়ের দু'দিন আগে ধরে নিয়ে জেলে পূরেছে। পুলিশের আর খেয়ে-দেয়ে কম্মো নেই, ঠিক বিয়ের আগে ওকে ধরার জন্য ওৎ পেতে ছিল। হাড়ে হাড়ে চালাকি!

আবার বলে, ধরেছে কিনা ভগমান জানে। চাদ্দিকে ধরপাকড়, একটা খবর দিলেই হল—মোকেও পাকড়েছে

গো, বিয়ে হবে না কো, মোর কোন ঘাট নেই। তুই তো রইলি হাতের পাঁচ, ওদিকে কোথা ফুর্তি করছে।

রেবতী ঠোঁট উল্টে বলে, আহা, যেন ধরতে পারে না কো! কারখানায় গোলমাল চলছে বলছিল না?

বলতে বলতে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে বলে, টের পেয়েছি ব্যাপার। ফুর্তিতে মন চন-চন করছিল—কি করি করি। দু'চারটে স্যাঙ্গাতকে বলতে গিয়েছিল ব্যাপার, বান ডিঙ্গিয়ে বিয়েতে আসতে হবে। গিয়ে ফুর্তির চোটে এগিয়ে গেছে হাঙ্গামার ব্যাপারে, হিসেব নিকেশ বাদ পড়েছে—ওমনি ধরেছে খপ করে।

গিরি বলে, ও বাবা! বিয়ে গেল বাতিল হয়ে তবু তুই দেখি ভাবের ঘোরে গদ গদ!

রেবতী মুখ বাঁকিয়ে মাথা নেড়ে বলে, না গো মামী, ভাগ্নীটা তোর বড্ড বোকা মেয়ে। একেবারে হাড় চাষাড়ে বোকা। একবার কি খেয়াল হল জিগ্‌গেস করি কলে কাজ কি করে, কি জন্যে গণ্ডগোল? কে জানে, মরে গিয়েও থাকতে পারে।

না, রেবতীর বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস-নেই। তাকে পাওয়ার জন্য যে পাগল, তার মামা-মামীরা বন্যার মধ্যেও জোর করে বিয়েটা ঘটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করায় হাতে যে স্বর্গ পেয়েছে—সে কখনো স্বেচ্ছায় এ-রকম করে?

আপশোষে ফেটে যেতে চায় রেবতীর বুক। কিসের কল, কলে তার কি খাটুনি, কি নিয়ে কেন হাঙ্গামা এসব যদি খুঁটিয়ে জেনে রাখত, যদি একবার খেয়াল হত যে

হঠাৎ হাতে স্বর্গ পাওয়ার উত্তেজনায় মানুষটা হয় তো দু'টো দিন সবুর করার কথা ভুলে গিয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে পারে, আজ তাহ'লে কি তাকে এমন অন্ধকারে হাতড়াতে হত ভাগ্যের এই অদ্ভুত খেলার মানে বোঝার জন্য!

হয়ত সে সাবধান করেও দিতে পারত, সামলে নিতে পারত গোবিন্দকে।

শরীরটা খারাপ ছিল গিরির। গভীর রাত্রে গোবর্দ্ধন ডাকতে এলে এমন ভাবে খ্যাঁকখেঁকিয়ে উঠে তাকে খেদিয়ে দেয় যে, মামার জন্য মমতা বোধ করে রেবতী।

গিরি ছটফট করতে থাকলে তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে নিজের আপশোষের কথাগুলি জানায়।

গিরি তাকে আদর করে চুমো খেয়ে বলে, আঃ, মরণ তোর! কলে-খাটা মানুষকে চিনলি নে? কত ভাবছে তোর জন্যে, বিয়ে হয়েছে কি না হয়েছে তার জন্যে! কলের কাজ, গুরু-পুরুত মানতে পারে না—কলে-খাটার অহঙ্কারে ফেটে পড়ে যায়। মোর এক ভাই কলে খাটত জানিস? মায়ের পেটের ভাই!

মায়ের পেটের ভাই? কলে খাটত?

তবে কি! সবাই হৈ-চৈ করে বারণ করেছিল, কারো কথা শোনে নি। তার শুধু এক কথা—পরের ক্ষেতে কেন খাটব, কলে খেটে মজুর হব। সংসারটা সামলেছিল দু'বছর। কিন্তু হলে কি হবে, চাষার ছেলে তো, বেনিয়মের কল তো! বাপ দাদা গুরু-ঠাকুর কারো কথা শুনলে না, কোন নিয়ম

মানলে না, তিনটে বছর জিদ চালিয়ে ঘরে ফিরল, তিন মাস রক্ত-বমি করে শেষ হয়ে গেল—যাঃ।

অনেকক্ষণ গিরির আলিঙ্গনে চুপ করে থেকে রেবতী ধীরে ধীরে ডাকে, মামী ঘুমিয়েছিস্ নাকি ?

গিরি বলে, পোড়া চোখে ঘুম কি আছে রে ?

রেবতী মিষ্টি সুরে বলে, যা না মামী মামার কাছে—মামা এমন করে সেধে গেল !

গিরি তার গালে চিমটি কেটে চুমো খেয়ে বলে, তুই সত্যিকারের চাষীর মেয়ে নোস্। মামা তোর জেগে আছে ভাবছিস ?

একটা কথা খেয়াল করে নিজেকে বড়ই বোকা-হাবা মনে হয় রেবতীর। গিরি শুধু এলোমেলো জেরাই করে গেল প্রমথকে, গোবিন্দের খবর সে আর কিছুই কেন জানে না, তার অজুহাতটাই শুধু জানা গেল। খেয়াল করে সে যদি আরও বিস্তারিত খবর আনিয়ে দেবার জন্য প্রমথকে অনুরোধ করত !

যে ভাবেই হোক, তার মারফতেই গোবিন্দের সংবাদটা এসেছে—ওভাবে অন্যান্য খবর আনিয়ে সে অনায়াসেই দিতে পারে নিশ্চয় !

মামা মামী। বলতে লজ্জা করে।

নওপাড়া বেশী দূরে নয়। নিজেই সে চলে যাবে এক ফাঁকে, একা যাওয়া অবশ্য উচিত হবে না তার পক্ষে, এত ভাব জমে থাকলেও গিরিই হয় তো তাকে ঝাঁটা-পেটা করবে—কিন্তু অত ভাবলে কি তার চলবে, এত ভয় করলে !

বাইরে চোখ পেতে রেখে রেবতী ভাবে, নানা চিন্তা তোলপাড় করে তার মনে।

মামাবাড়ী এসে নওপাড়ার মেলায় কয়েক বার গিয়েছে, পথ চিনে গাঁয়ে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু মানুষকে জিজ্ঞাসা করে করে খুঁজে বার করতে হবে প্রমথের বাড়ী।

বাইরে চোখ পেতে দাওয়ার খুঁটি ধরে রেবতী দাঁড়িয়ে থাকে, গিরি টেরও পায় না তার মনে কি দুঃসাহসিক চিন্তার তোলপাড় চলেছে।

তখন নদীর দিক থেকে ছেলে-কোলে এলোকেশীকে আসতে দেখা যায়। বন্যা নামার ক'দিন আগে কঠিন রোগ হয়ে ফণিকে সদরের হাসপাতালে যেতে হয়েছিল—সঙ্গে গিয়েছিল এলোকেশী। বাড়ীতে আছে শুধু বুড়ী শাশুড়ী।

ছেলে কোলে সে একলা ফিরছে!

রেবতী তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করে, খবর কি বোন?

এলোকেশী বলে, খবর জানতেই তো এলাম গো! চলে গাঁ ভেসে গেছে শুনলাম—তা করব কি! আসবার তো উপায় ছিল না কো—সাঁতার কেটে আসতে হত। জল কমেছে খবর পেয়ে দেখতে এলাম শাউড়ী মাগী বেঁচে আছে না ভেসে গেছে।

একলা এলে! সোয়ামী কেমন আছে?

হাসপাতালে আছে। ছাড়া পেতে দেরী আছে, তবে বেঁচে যাবে এ যাত্রা। ভাগ্যি খগেনবাবু ছিল, নয় তো ঠাঁই মিলতো না হাসপাতালে। দেব্‌তার মত মানুষটা।

কৃতজ্ঞতায় গলা বুজে আসে এলোকেশীর।

রেবতী ভাবে, সদরে কুটুমবাড়ী থেকে এলোকেশী একলা গাঁয়ে এল শাশুড়ীর খবর নিতে, আর বিশেষ দরকারে পাশের গাঁ থেকে একবার ঘুরে আসতে তার এত ভয় ভাবনা? রেবতী আর ঘরেও ঢোকে না, সোজা রওনা দেয় নওপাড়ার দিকে।

বেশী মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, পুরুষকেও জিজ্ঞাসা করতে হয় না, দু'বার পথ চল্‌তি দু'জন মেয়েছেলের কাছে খোঁজ করেই রেবতী প্রমথের বাড়ীর হদিস পেয়ে যায়।

খড়ের চালার বড় বড় বাড়ী। প্রমথ বেরিয়ে যাচ্ছিল, রেবতী প্রণাম করতে সে একটু আশ্চর্য্য হয়েই তার দিকে তাকায়।

এখন তার বেশ অন্য রকম। পরনে থান-ধুতি, কাঁধে উড়ানি, টিকিতে ফুল বাঁধা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, হাতে পূজার ফুল-পাতার পাত্র।

রেবতীও তার বেশ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, সেদিন কল্পনাও করা যায় নি যে প্রমথ পূজারী ব্রাহ্মণ।

আমায় চিনলেন না? কাল যে খবর দিতে গেছলেন গোবরহাটায়—

চিনেছি—চিনেছি। কি ব্যাপার বল তো?

মাথা নীচু করে রেখে লজ্জায় জড়িয়ে জড়িয়ে রেবতী বলে, যার খবর দিয়েছিলেন, তার অন্য খবরগুলি আনিয়ে দিন—

প্রমথ হেসে বলে, বটে! তোমার বাপের নাম কি গো বাছা? গোবর্দ্ধন তোমার কে হয়?

রেবতী নিজের পরিচয় দেয়, সলাজ ভাবে বলে, ওই যে সাপে-কাটা একজনকে বাঁচিয়ে ছিল একটা মেয়ে?—আমি সেই রেবতী।

বটে! গোবিন্দই বুঝি সেই সাপে-কাটা মানুষ?—এসো তো বোন, ঘরে এসে একটু বসে দুটো সন্দেশ মুখে দিয়ে যাও।

পা ধুয়ে রেবতী বড় ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে, একেলে পাড়ের রঙ্গীন শাড়ী আর শায়া-ব্লাউজ-পরা একটি বৌ রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, কে গো?

প্রমথ বলে, এ আমাদের সেই রেবতী গো।

বৌটি হাসিমুখে রেবতীর বিবরণ শোনে আর রেবতী ভেবে পায় না তাকে কি করে এই পূজারী বামুনটির বৌ ভাববে!

গতকালের ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা লোকটির বৌ বরং ভাবা যায় কিন্তু এরকম একেলে ফ্যাসানের বেশভূষা কি করে খাপ খায় এই বেশধারী প্রমথের সঙ্গে!

রেবতীকে নৈবিদ্যের সন্দেশ কলা ইত্যাদি খেতে দেওয়া হয়, অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাই তারা জিজ্ঞাসা করে, তারপর হাসিমুখে প্রমথ বলে, পরশু নাগাদ গোবিন্দের খবর পাবে, কিন্তু একটা কথা দিতে হবে। তোমাদের বিয়েতে আমায় পুরুত করতে হবে।

রেবতী একটু হাসে।

প্রমথ বলে, বাজে পুরুত ভেবো না আমায়—বি-এ পাশ পুরুত আমি।

বি-এ পাশ?

তবে কি? পাশ করে তিন চার বছর চেষ্টা করেও চাকরী পেলাম না, দুত্তেরি বলে দেশে এসে বাপের ব্যবসা ধরলাম। চাষবাস করে, পুরুতগিরি করে চালিয়ে দিচ্ছি।

প্রমথ হাসে, একলা ফিরে যেতে পারবে তো?

একলাই তো এলাম।

পরশু গোবিন্দের সব খবর পাওয়া যাবে। ফিরবার সময় হাঁটতে হাঁটতে রেবতী ভাবে, কিন্তু কেন? তাকেই কেন এভাবে গোবিন্দের খবর পাবার ব্যবস্থা করতে হবে—তার কি কেউ নেই?

সাহস করে বেরিয়ে পড়ে অবশ্য ভালই হয়েছে, এলোমেলো ভয় করে চললে যে সংসারে অনেক কিছুই হয় না, এটা ভাল করে টের পেয়েছে, প্রমথদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় খুসীও হয়েছে।

কিন্তু এ কি রকম উদ্ভট ব্যবহার তার বাপ দাদার? একবার তারা খবর নেয় না, একটা তাকে খবরও দেয় না।

গোবিন্দের উপরেই ছিল তার বাপ-ভাইকে সব জানাবার এবং বুঝিয়ে তাদের রাজী করাবার ভার। এরকম নমো নমো করে মামা-মামী তার বিয়ে চুকিয়ে দিচ্ছে বলে কি সবাই চটে গিয়ে তার খবর নেওয়া বন্ধ করেছে?

কিন্তু এভাবে বিয়ে হওয়া যদি পছন্দ না-ই হয়, গোবিন্দের সঙ্গে বিয়ে দিতে যদি আপত্তিই থাকে—একবার

এসে তার মামা-মামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ব্যবস্থা পাল্টে দেবার কিম্বা বিয়ে বাতিল করার চেষ্টা না করে শুধু চটেমটে হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে?

গোবিন্দ কি তবে ওদের কিছু জানায় নি? পাছে ওরা গোলমাল করে, কোন রকম বাধা পড়ে, এই ভেবে চুপ করে ছিল—বিয়েটা চুকে যাবার পর জানাবে মতলব করেছিল।

কে জানে কি ব্যাপার!

ঘরে গিরি রাগ করেনি দেখে রেবতী সত্যই আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

বার কয়েক মাথা নেড়ে মুখভঙ্গি করে গিরি শুধু বলে, সত্যিকারের বেহায়া ছিলি বটে তুই। সাধে কি বাপ-ভাইকে মামা বাড়ীতে খেদিয়ে দিতে হয়!

গাঁয়ে একটু ঘুরে এলে বেহায়া হয় নাকি?

বকিস নে বেশী—গাঁয়ে একটু ঘুরতে গেছলেন! আমি যেন আর খবর পাইনি কোথায় গিয়েছিলি। প্রাণেশ দেখে এসে বলে যায়নি মোকে?

তাই বটে—রেবতীর খেয়ালও ছিল না যে নওপাড়ায় তার মেসোর বাড়ী। তার মাসী পটল তুলেছে অনেক কাল, মেসো আবার বিয়ে করেছে, বহুকাল আত্মীয়তা নেই, যাতায়াত নেই।

গিরি আর কিছু বলে না। রেবতীও চুপ করে থাকে। কিন্তু কতক্ষণ আর গিরি কৌতূহল চেপে রাখবে? প্রায় নরম সুরেই সে জিজ্ঞাসা করে, ঠাকুরমশায় কি বলল রে?

পরশু সব খবর আনিয়ে দেবেন। ঠাকুরমশায় বি-এ পাশ, জানো ?

কি পাশ তা কে জানে, কলকাতায় অনেক দূর পড়েছে শুনিছি। নাম শুনে চিনেছিলাম। বাপ করত যজমানি, ছেলেকে হাকিম করার সাধ ছিল।

সদর সহরের ছোটখাট হাসপাতালে ব্যাণ্ডেজ-মোড়া অচৈতন্য গোবিন্দকে দেখে এসে সমাজ সংসার নিয়ম-নীতির উপরেই মনটা বিষম রকম বিগড়ে যায় রেবতীর।

মনে হয়, চাষীর ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মে সে নিজেই মহাপাপ করে নি, তাকে জন্ম দেওয়ার জন্য তার মা-বাপকেও জন্ম জন্ম নরক ভোগ করতে হবে।

গিরিও খুব বিচলিত হয়েছিল। কিন্তু সে শক্ত মেয়ে-মানুষ। বার বার সে রেবতীকে বলে, উতলা হোস্ নে, ভড়কে যাস্ নে। দিন-কালটা খেয়াল রাখিস্। একেবারে যে মরে যায় নি তাই অনেক ভাগ্যি বলে মানিস্।

রেবতী ফুঁসে ওঠে, কেন ভাগ্যি বলে মানব? কার কাছে কি অপরাধটা করেছি?

অনেক অপরাধ করেছিস্। তুই এরকম হাবাগোবা বলেই তো ক'জনকে মরতে হল, তোর মানুষটাকে জখম হয়ে হাসপাতালে যেতে হল।

নাকি বটে!

তবে কি? মানুষ কি খেয়াল খুসীতে মরে, না জখম হয়ে হাসপাতালে যায়? তোর তরে মোর তরেই তো!

গিরিকে বড়ই আপনার মনে হয় রেবতীর।

বলে, আয় মামী উকুন বেছে দি'।

হাসপাতাল থেকে গোবিন্দ যথা সময়ে খালাস পায়।

যথা সময় মানে আরও যত দিন থাকা উচিত ছিল দরকার ছিল তার চেয়ে ঢের দিন আগে।

ঘরে ফিরে পুরানো খড়-বিছানো গদির বিছানায় শুয়ে দিন কাটায়। নতুন খড় দিতে পারলে বিছানাটা আরেকটু নরম হত। কিন্তু কোথায় পাবে নতুন খড়? বন্যা এবার দফা-রফা করে দিয়ে গেছে আউস ধানের।

গোবিন্দরা এক দানা ফসল পায়নি, একটি খড় পায় নি। বেশীর ভাগ চাষীরই এবার এই ভাগ্য।

কুমারেশ প্রমথেরা উদ্যোগী হয়ে সহরে একটা গেঁয়ো গানের আসর বসিয়ে কিছু টাকা তুলে দেবার ব্যবস্থা না করলে গোবিন্দ সম্ভবত তার খড়ের গদির বিছানাটা ত্যাগ করত একেবারে শ্মশানে যাবার সময় আরও হাল্‌কা আরও সস্তা বিছানায় আশ্রয় নেবার জন্য।

দু'চার টাকার চাঁদা খুব কম পাওয়া গেলেও দু'চার আনা চাঁদায় মোট টাকা নেহাৎ কম ওঠে নি—প্রায় দু'শোর মত। খুব ভিড় হয়েছিল গানের আসরে।

কেন এ রকম সাড়া পাওয়া গেল সহরের মানুষের কাছে? সহরে দুষ্প্রাপ্য গ্রাম্য গানের জন্য? গোবিন্দের জন্য অথবা রেবতীর জন্য? কুমারেশও হিসাব নিকাশ করে কোন সিদ্ধান্তে আসতে সাহস পায় নি।

ঘোষণা করা হয়েছিল যে রেবতীও দু' একখানা ছড়া-গান গাইবে। রেবতী রাজী হয়েছিল। প্রথমেই তার ছড়া-গান গাওয়ার পালা।

আবার সভা। আবার সকলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলা।

রেবতী ছড়া-গান দিয়ে সুরু করে নি। মিনিট দশেক বলে গিয়েছিল তার মত মেয়েদের অবস্থার কথা। জ্ঞানী গুণী বিদ্বানের বক্তৃতার ভাষা বা ভঙ্গিতে নয়, প্রাণের জ্বালায় কোঁদল করার সহজ সরল ভাষা আর ভঙ্গিতে।

বলতে বলতে রাগ যেন মাথায় চড়ে গিয়েছিল রেবতীর, খোঁপা খুলে চুল এলিয়ে দিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে তারপর চেঁচিয়ে বলেছিল, ছড়া-গান জানি না। শুধু ছড়া শুনবেন--ছড়া?

আসর যেন ফেটে পড়েছিল আগ্রহে, শুনব, শুনব,—ছড়াই শুনব।

রেবতী সুর করে গেয়ে গিয়েছিল মনসা-ভাসানের বটতলার চল্‌তি ছড়ার খানিকটা অংশ। সাপে-কাটা মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা ভেসে চলেছে ভেলায়, তার রূপে মুগ্ধ প্রেমিকেরা ডেকে ডেকে বলছে, "সুন্দরী লো, আমার ঘরে আয়, তোর মড়া জিয়াইয়া দিবে কে?"

বেহুলা ডাক শোনে না, ভেসে চলে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ করা আনন্দে মত্ত হয়ে বাঁচার ডাক, শাড়ী, গয়না, দাস-দাসীতে রাজরাণীকে হার মানাবার ডাক, আদর, আহ্লাদ সোহাগের রসে হাবুডুবু খাবার ডাক—কিছুই কানে তোলে না বেহুলা।

কত কালের পুরানো কত বারের শোনা ছড়া। গলা-কাঁপানো টানা সুরে গেয়ে যেতে যেতে রেবতী যেন রসিয়ে যায়, জমে যায়, মজে যায়। সুরুতেই সে এমন ভাবে জমিয়ে না দিলে আগাগোড়া গানের আসর হয় তো এ রকম জম-জমাট হত না, আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আহূত

মরণাপন্ন একজন চাষীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ডাক দিয়ে একেবারে দু'শো টাকার মত চাঁদা তোলা যেত না।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কুমারেশ এবং অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মুখ। আসর জমে গিয়ে মশগুল হয়ে শোনে।

ঘরে ফিরে গিরি বলেছিল, অ! তোর তবে সব বেউলেপণা! সাপে-কাটা মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে তাকে নিয়ে মজে যাস্!

রেবতী বেহায়ার মত বলে ছিল, লাঠি-পেটা মানুষ বল। বাঁচলে হয়।

গোবিন্দ উঠে চলাফেরা সুরু করতে করতে আরেক পূজা এসে যায়।

ভয়ানক বন্যা যেন হয়নি দু'মাস আগে। সর্ব্বনাশ যেন ঘটে নি মানুষের। শরতে আবার কিশোরী হয়েছে ধরণী, আকাশ হয়েছে সুনীল, গাছপালা ঘাস লতা হয়েছে সতেজ ও সবুজ, ডোবা পুকুরে ফুটেছে শালুক, মাঠে মাঠে বাতাসে দোল খাচ্ছে কচি শস্যের চারা।

অতএব আনন্দ কর।

মেতে যাও পূজায় উৎসবে।

কি হবে সর্ব্বনাশের কথা ভেবে? কি হবে ক্ষেতের চারা বড় হয়ে ফসল ফলা আর ঘরে তোলা পর্য্যন্ত বাঁচার উপায় চিন্তা করে করে কাতর হয়ে?

জগৎ যার, জীবন যার—মানুষকে বাঁচানোর দায় আর ভাবনাও তার।

অতএব আনন্দ কর।

একদিন কুঞ্জ আসে, রেবতীকে নিয়ে যাবে। চিরকাল মামাবাড়ীতে পড়ে থাকলে চলবে কেন?

বাড়ীতে বড়ই ঝন্‌ঝাট চলেছে। এবার ম্যালেরিয়া ধরেছে তিন জনকে, রেবতীর মা, পিসী আর মেজ ভাই যদু পালা করে জ্বরে ভুগছে। রেবতীর মা রাজুই ভুগছে সব চেয়ে বেশী, এমন রোগা আর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে জ্বর ছেড়ে যাবার পরও বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারে না, দিনরাত কাঁথা গায়ে দিয়ে থাকে। ঘর সংসারের কাজকর্ম পিসী কোনরকমে চালিয়ে যাচ্ছিল, পিসীকেও জ্বরে ধরার পর হয়েছে মুস্কিল। পিসী কাত হলে ব্যাটাছেলেদের সব করতে হচ্ছে!

কাজেই রেবতীর এবার ফিরে না গেলে নয়।

রেবতী জিজ্ঞাস করে, চিকিচ্ছে করছ না মার?

কুঞ্জ বলে, করছি তো। শালার কি ওষুধ যে দেয় ডাক্তার, আজ জ্বর ছাড়ে তো কাল ফের জ্বর আসে। পাঁচন খাচ্ছে।

গিরি বলে, নিয়ে যাবে বলছ, হাঙ্গামার ভয় কেটে গেছে? যে জন্যে তাড়াহুড়ো করে মেয়াকে পাঠিয়ে দিয়েছিলে?

কুঞ্জ মরিয়ার মত বলে, হাঙ্গামা হলে হবে, করব কি। অত ভয় করলে চলে না।

কুঞ্জকে ম্যালেরিয়া ধরে নি কিন্তু সে পেট রোগা হয়ে গেছে। তার খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-ভরা মুখে যেন লেপ্‌টে আছে শ্রান্তি আর হতাশার ভাব।

রেবতী বড়ই মমতা বোধ করে। মোর জন্যে ভাবতে হবে না তোমাদের। তোমরাই মিছিমিছি ভয় পেয়ে মোকে ভাগিয়ে দিলে, কে কি করত শুনি?

গিরিও সায় দিয়ে বলে, তখন গোলমাল করলেও করতে পারত হয়তো, এখন সাহস পাবে না। যা নাম ছড়িয়েছে, মেয়ারা ওর পিছনে লাগলে দশ গাঁয়ের মানুষ হৈ-হৈ করে রুখে উঠবে।

কুঞ্জ হাই তুলে বলে, ওটাই তো আসল বিপদ গো।

গিরি বলে, না না, সে দিনকাল আর নাই। এখন আর ওতে কেলেঙ্কারি হয় না।

এবেলা থাকবে কুঞ্জ, দুপুরে খেয়ে দেয়ে রেবতীকে নিয়ে রওনা দেবে। তার জন্যে গিরি দু'একটা বিশেষ তরকারী রান্না করে, গোটা কয়েক ল্যাঠা মাছও যোগাড় করে।

কিন্তু গিরির মুখে ঘনিয়েছে বিষাদ। থেকে থেকে বলে, তুই গেলে কাকে নিয়ে থাকব লো?

রেবতীরও মন খারাপ হয়ে গেছে। কি ভাবেই প্রাণের টান গড়ে ওঠে এক একটা মানুষের সাথে—ছাড়াছাড়ির নামে কান্না পায়।

মুখে সে বলে, আগে কাকে নিয়ে ছিলে?

গিরি বলে, আগের কথা বাদ দে, তখন তো ছিলি না তুই। অ্যাদ্দিন রাতে জড়িয়ে ধরে শুয়েছি, একলাটি ঘুম আসবে আর? এইজন্যে যার তার ওপর মায়া বাড়াতে নেই।

তার কাঁদা-কাঁদা মুখ দেখে রেবতী এবারে কেঁদে ফেলে, মোর খুব ফূর্তি লাগছে ভাবছ বুঝি মামী?

গিরি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, যাক যাক, কাঁদিস নে। যাচ্ছিস যা, বিয়ে কিন্তু তোর এখানে দেব আমি, ভটচাজ মশায় পুরুতের কাজ করবেন।

রেবতী মুখ বাঁকিয়ে বলে, বিয়ের কথা রাখো, মানুষটা আগে সামলে উঠুক। কাজ রইবে কিনা ভগমান জানে। হতাশ ভাবে নয়, ব্যঙ্গের সঙ্গে রেবতী বলে, বিয়ে সাধ মিটে গেছে মামী। বিয়ে বললে তো জম্মো দেব কতগুলো অভাগা ছেলেমেয়ের? না গো মামী, বিয়ের মজায় মোর কাজ নেই।

কথার সুরে ব্যঙ্গ আর ঝাঁঝ—কিন্তু কি নিরাশামূলক তার কথাগুলি!

একদম ভড়কে গেছিস্?

মোটেই ভড়কাই নি।

রেবতীর যে নাম ছড়িয়েছে, অনেক গাঁয়ের অনেক মেয়ে পুরুষ যে তাকে আপন ভেবে নিয়েছে, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মুখে মুখে এক সকালে ছড়িয়ে যায় খবর।

রেবতী গোবরহাটা থেকে বিদায় নিচ্ছে। কোন দিন আর আসবে কি না সন্দেহ!

খবর রটার পর প্রথমে একে দুয়ে তারপর দলে দলে মেয়েপুরুষ ভিড় করে আসতে সুরু করে, জানতে চায় যে ব্যাপার কি, রেবতী কেন গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কবে আবার ফিরে আসবে।

আশী বছরের বুড়ী যশোদা কেঁদে বলে, না লো, তুই

যাস্‌নে, মোদের ফেলে যাস্‌নে। কাণ্ড হচ্ছে চাদ্দিকে—মোরা বুঝিনে, ভড়কে যাই। তুই বুঝিয়ে দিতে পারিস্‌ সবাই মোরা তোর ভরসা এয়েছি।

গলা উঁচু করে সকলকে শুনিয়ে রেবতী তাকে বলে, আমি আবার আসব গো, আসব। এমনি যদি না আসা হয় তোমরা খবর দিলেই আসব।

গিরি আরও গলা চড়িয়ে বলে, মোর ঘরে বিয়ে বসতে মেয়ে ফিরে আসবে গো!

সকলে কলবর করে ওঠে।

মানুষ আসে যায়। দশ-পনের জনের ভিড় জমেই থাকে।

খাওয়া দাওয়ার পর আর রেবতীর রওনা দেওয়া হয় না। খবর আসে যে বিকালে একটা মিছিল করে তাকে নদী পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবার ইচ্ছা আছে গাঁয়ের লোকের—সে যেন আগেই চলে না যায়।

গিরি বলে, ও বাবা, মিছিল করে এগিয়ে দেবে! তুই কি হয়ে উঠলি রেবতী!

কুঞ্জ বিরস মুখে বসে থাকে।

একি অদৃষ্টের পরিহাস? অথবা এই তামাসার নামই জীবন?

দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, বড়ই এখন অসময়। কাজ নেই বলে গোবিন্দের একার নয়, সকলের অবস্থাই কাহিল। নিজেকে এবং অন্য যাদের বাঁচিয়ে রাখার দায় আগে থেকেই ঘাড়ে চাপানোই ছিল, সে দায় পালন করতেই প্রাণান্ত। কোন মতে মরণ ঠেকিয়ে চলার প্রাণপণ চেষ্টা।

নতুন দায় তাই সাধ করে নেওয়া যায় না। এবং রেবতীকে বিয়ে করা মানেই তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়টা গোবিন্দের কাঁধে চাপা।

গোবিন্দ পিছিয়ে দিয়েছে বিয়ের দিন—অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে। কে জানে কবে শেষ হবে এই আকাল আর তার বেকারির দুর্ভোগ—কবে তার বিয়ে করার সামর্থ্য ফিরে আসবে।

অত বড় মেয়েকে আইবুড়ো রেখে এ ভাবে অপেক্ষা করায় যদি তারা রাজী না থাকে, অন্য কোন পাত্রে তাকে সমর্পণ করা হোক।

কুঞ্জ প্রায় ক্ষেপে যায়, গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলে, শালার বেটা শালা, ছ্যাঁচড়ামি পেয়েছিস্? অ্যাদ্দিন ধরে ইয়ার্কি দিয়ে, চাদ্দিকে কেচ্ছা রটিয়ে, আজ বলছিস বিয়ে করবি না? তোর বাবা বিয়ে করবে, নইলে তোকে খুন করব।

গোবিন্দের বাবা রেবতীকে বিয়ে করলে যে কুৎসিত রকম কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হবে, রাগের মাথায় সেটা খেয়াল থাকে না বলে মুখে বলতেও বাধে না। এবং বলতে বলতে রোখ আরও চড়ে যাওয়ায় সত্যই সে হঠাৎ মোটা বাঁশের গোড়াটা কুড়িয়ে নিয়ে গোবিন্দের মাথা ফাটিয়ে দিতে যায়। অর্জুন, পরেশ, খাঁদা, দিগম্বরেরা তাকে জোর করে ধরে না রাখলে সত্যই খুনোখুনি ব্যাপার দাঁড়াত। এরকম রাগের সময় ওই কাদা-মাখা বাঁশের গদা গোবিন্দের মাথায় বসিয়ে দিলে তাকে আর বাঁচতে হত না।

অর্জুন কুঞ্জকে ঠেকিয়ে রাখলেও নিজে রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ঠিক কথাই তো, এটা তোমার কেমন বিবেচনা গোবিন্দ ?

বুড়ো যোগীরাজ কাসতে কাসতে কফ তুলে যেন ধিক্কার দেওয়ার থুতু ফেলে বলে, ছি ছি, তুই এমন নচ্ছার গোবিন্দ! ও মেয়াকে কেউ বিয়া করবে ? তোর সাথেই টিক টিক বিয়া বসবে জানে বলেই না দশ জনা চুপ মেরে আছে। হাসাহাসি করুক আর যাই করুক, কেচ্ছা রটেনি। তোর সাথে বিয়া বসবে না খপর রটলে ঢি ঢি পড়ে যাবে না চাদ্দিকে ?

গোবিন্দ বিশেষ ঘাবড়েছে মনে হয় না।

মুখ তুলে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সে অর্জুনকে উদ্দেশ করে বলে, কথাটা তোমরা বুঝছ নি কেন ? আসল কথাটা ধরবে নি—

কুঞ্জ গর্জ্জন করে উঠলে যোগীরাজ রেগে-মেগে তাকে ধমক দিয়ে বলে, তুই একটু থাম দিকি বাবা ? মানুষটা কি বলছে

চায় শুনতে দে? মস্ত তুই বীরপুরুষ, আজ বাদে কালই নয় ওকে খুন করে ফাঁসি যাস্!

গুড়ের কারবারী প্রৌঢ় ঘনরাম সায় দিয়ে বলে, ঠিক কথা। বড় তুই তেড়িবেড়ি করিস্ কুঞ্জ। একটা মীমাংসা করে দিতে মোদের ডেকে এনেছিস্, ঠাণ্ডা মাথায় কথাবার্তা কইতে দে! ব'লে ঘনরাম বিশেষ ধরণে একটু হাসে—সত্যই হাসে। বলে, বোকা রাম, খুন করে ফাঁসি যাওয়া এতই সহজ ভেবেছিস? এবেলা ডাণ্ডা মেরে এক জনাকে খুন করলাম, ওবেলা দিব্যি আরামে ফাঁসি গিয়ে ব্যাপার চুকিয়ে দিলাম? তুই একেবারে গোমুখ্খু!

রসিক মানুষ বলে ঘনরামের খ্যাতি আছে। লোকে বলে গুড়ের কারবার করতে করতে যোয়ান কালেই মাথায় টাক পড়ে যাওয়ায় তার এত রস—সর্ব্বত্র সব অবস্থায় সে এমন লাগসই রসিকতা করতে পারে।

পঞ্চায়েত নয়, কয়েক জনকে বলে কয়ে সঙ্গে নিয়ে কুঞ্জ তার ঘরে হানা দিয়েছে। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ধমক ধামক দিয়ে ভয় দেখিয়ে যদি একটা নিষ্পত্তি করা যায় এই আশায়।

যোগীরাজ ঘনরাম এরা সব আছে, গোবিন্দ কিন্তু অর্জ্জুনের দিকে চেয়ে তার বক্তব্য বলে যায়।

বলে, একবার বলেছি বিয়ে করতে সাধ নেই? এক পায়ে খাড়া নই? খ্যামতা নেই তো করব কি বলো? মোর ঘরের মানুষ উপোস দিয়ে ক'দিনে মরবে, নিজে ক'দিনে মরব, ওই চিন্তা নিয়ে আছি। পরের ঘরের

একটা মেয়াকে ঘরে এনে উপোস করিয়ে মেরে ফেলার মানে হয় ?

সবাই চুপ করে থাকে। কুঞ্জ পর্য্যন্ত যেন খানিকটা ঝিমিয়ে যায়, শান্ত হয়ে যায়।

গোবিন্দ বলে, তাই বলছিলাম কি, আজ রাত্রেই বিয়াটা চুকিয়ে দাও, আপত্তি নেই। তবে কিনা, আগে থেকে মানতে হবে—যদ্দিন না খাওয়াবার সাধ্যি হয়, বৌ ঘরে আনব নি।

কুঞ্জ মুখ খুলতে গিয়ে যোগীরাজের গাঁট্টা খেয়ে চুপ হয়ে যায়।

পিচঢালা সরকারী সদর সড়কের ওপাশে লোণা জলের পলিমাখা শস্যহীন শূন্য কুৎসিত ক্ষেতের দিকে চেয়ে গোবিন্দ বলে, কিম্বা এক কাজ কর। মোর দিন চলার একটা ব্যবস্থা করে দাও। বৌ ঘরে এলেও কোন মতে শুধু বেঁচে-বর্তে রইব—তাতেই হবে।

যোগীরাজ আবার কেসে কফ তুলে বলে, অ!

অর্জুন জিজ্ঞাসা করে, লাট মাঠের ধানও পাস নি ?

গোবিন্দ বলে, লাট মাঠের জমির ধার ধারি ?

ঘনরাম রসিকতা করে বলে, লাট মাঠে জমি থাকলেই বা কি হত! লাটের মাঠের ধান লাটের বাড়ী চালান যায়।

গোবিন্দকে বাগাতে পারে না।

একটা মীমাংসায় এসে অগত্যা তারা সেদিনের মত বিদায় নেবে।

কুঞ্জকে ধরে-বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে হয় না, সে শান্ত ভাবে স্বেচ্ছায় তাদের সঙ্গে চুপচাপ উঠে যায়।

যোগীরাজের গাঁট্টা খেয়ে চুপচাপ উঠে গেলেও মাথাটা টন টন করে কুঞ্জর। গোবিন্দের অকাট্য যুক্তি সে ফেলতে পারে না। শূন্য ক্ষেতের দিকে চেয়ে খুব আস্তে আস্তে হেঁটে গাঁয়ে ফিরে আসে।

রাজু অঘোর চারু সকলের সামনে কুঞ্জ আবার গর্জন করে ওঠে, তিন গাঁয়ে কেচ্ছা রটেছে, এখন শালা বলে কিনা বিয়া করবে না—

ছেঁড়া ভিজে কাপড় বেড়ার ওপর নেড়ে দিতে দিতে রেবতী মাথা তুলে বড় ভাইএর দিকে তাকায়। কথার উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না তার।

যে লোক উপোস করে মরতে বসেছে তাকে কোন আক্কেলে বিয়ের কথা বলতে যাওয়া!

নিথর ঢেঁকির দিকে তাকিয়ে আবার সে কাপড় নেড়ে দিতে থাকে।

খক খক করে কেশে অঘোর জিজ্ঞাসা করে, কি হল? চোখ বড় হয়ে যায় কুঞ্জর।

কাশতে কাশতে সে আবার চেঁচায়, শালার বেটা বলে কিনা বিয়া করতে পারি, তবে যদ্দিন না খাওয়াবার সাধ্যি হয় বউ ঘরে আনবনি—

রেবতী কুঞ্জর মুখের ওপর বলে বসে, মানুষটা আগে সেরে উঠবে নি? কাজ করবে নি?

জ্বরটা বোধ হয় আবার তেড়ে আসছে রাজুর।

তবু তীক্ষ্ণ গলায় ঝাঁঝালো ধমক আসে, বুতি, থাম্ বেহায়া মেয়ে!

কুঞ্জর কাছ থেকে বিবরণ শুনে অঘোর কথা বলে না। শুধু কটমট করে রেবতীর দিকে চেয়ে থাকে। তার দৃষ্টি দেখে মনে হয় সে বুঝি মেয়েটাকে ভস্ম করে ফেলবে।

কিন্তু রেবতী গ্রাহ্য করে না।

তর্ক করতে ইচ্ছা করে না রেবতীর।

গোবিন্দকেও অমানুষ বলে মনে হয় না।

জীবনের তামাসার কথা ভেবে নিজের সুখ দুঃখের কথা ভুলে যায়।

বিয়ের সাধ মিটে গেছে রেবতীর। সে দমে যায় না। কতগুলো অভাগা ছেলেমেয়ের জন্ম দেবার জন্যে বিয়েও করতে চায় না।

শুধু মরণ ঠেকিয়ে রাখতে হবে। কি হবে সর্বনাশের কথা ভেবে কাতর হয়ে? কি হবে অযথা গোবিন্দের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে? এই ঘোর দুর্ভিক্ষেও পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মরণ ঠেকিয়ে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

নিজেকে আর বোকা—হাবা সত্যিকারের চাষীর মেয়ে মনে হয় না রেবতীর। সে আন্দাজে বুঝে নেয় গোবিন্দকে এলোমেলো জেরা করে গালাগাল করে এসেছে কুঞ্জ। হদ্দ চাষীর ছেলে হলেও গোবিন্দের বুদ্ধির তারিফ করে রেবতী।

কোন ভরসায় এখন বিয়ে করবে সে? রেবতীকে সুখে

রাখতে চায় বলেই তো এখন সে বিয়ে করতে নারাজ। নিজের দায় বহন করবার যার ক্ষমতা নেই, যে মানুষ এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে, সে কোন আক্কেলে আর একজনের দায় ঘাড়ে নেবে ?

যে ভাবেই হোক গোবিন্দের খবর আনিয়ে নেবার জন্যে রেবতী ছটফট করে। গোবরহাটায় মামীকে এলোপাথাড়ি মনের কথা স্পষ্ট বলতে পারতো কিন্তু এখানে মুখ খোলবার উপায় নেই।

কড়া রোদ্দুরে সরকারী সদর সড়কের ওপাশে শস্যহীন কুৎসিত ক্ষেতের দিকে শূন্য চোখে চেয়ে রেবতী বসে থাকে। হতাশায় নয়, ব্যঙ্গের তীব্র ঝাঁঝে তার বুক জ্বলে যায়।

ওই রকম অভিভূত অবস্থাতেও গোবিন্দের খবর আনাবার কথা খেয়াল করে রেবতী।

তার মনে পড়ে যায় প্রমথর কথা—একেলে পাড়ের রঙ্গীন শাড়ী আর শায়া—ব্লাউজ পরা মিষ্টি বৌটির কথা।

আর একবার তাদের ওখানে গিয়ে উঠতে পারলে ভাবনা থাকে না রেবতীর। গোবিন্দের খবরও প্রমথকে দিয়ে আনিয়ে নেয়া যায়। প্রাণ খুলে কথা বলে সব বিবেচনা করে একটা মীমাংসায় আসা যায়।

এখান থেকে কেমন করে নওপাড়ায় যাবে রেবতী ? কাজটা সোজা নয় মোটেই। ফিরে এলে ঝাঁটা—পেটা করবে তার মা বাপ ভাই।

তবু ভয় পায় না রেবতী। নানা দুঃসাহসিক চিন্তা তোলপাড় করে তার মনে।

উপবাসে গোবিন্দ শুকিয়ে যাবে আর সে কিছু করতে পারবে না। কিছু জানতে পারবে না। শুধু অন্ধকারে হাতড়াবে ভাগ্যের এই অদ্ভুত খেলার মানে বোঝবার জন্যে।

জ্বরের ঘোরে প্রায় বেহুঁশ হয়ে আছে রাজু। কোলের ছেলেকে মাই দিতে দিতে চারু ঢুলছে। অঘোর আর কুঞ্জ কিসের আশায় ক্ষেতের দিকে গেছে কে জানে!

যা থাকে কপালে, এমন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না রেবতী। কোমরে শাড়ী জড়িয়ে সে মাটি—ফাটা রোদ্দুরে হন হন করে পথ চলে।

হোক রোদ। রোদে তার তেজ বাড়বে। দূরে তাকালে দেখা যায় পাক খেয়ে খেয়ে তাপ ওপরে উঠছে, দূরত্ব দুলে দুলে চোখে লাগিয়ে দিচ্ছে ধাঁধা।

কিন্তু নওপাড়া খুব বেশী দূরে মনে হয় না তার।

প্রথম পুঁটলি হাতে ঝুলিয়ে কোথা থেকে ফিরছিল। তার সঙ্গে রেবতীর পথেই দেখা হয়ে যায়।

কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রমথ মৃদু মৃদু হাসে।

কি গো বোন, আবার কি মনে করে?

রেবতী তাড়াতাড়ি তাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে।

থাক থাক। সুখী হও। এসো, ঘরে এসো, কপালের

ঘাম হাত দিয়ে মুছে প্রমথ চিৎকার করে বলে, ওগো দেখে যাও, সেই সাপে কাটা মেয়ে এসেছে—

বৌটি ব্যস্ত হয়ে বাইরে এসে রেবতীকে দেখে ফিক করে হেসে বলে, ওমা, এ যে আমাদের রেবতী। সাপে কাটা মেয়ে হবে কেন গো, সাপে কাটা মানুষকে বাঁচানো মেয়ে বল?

প্রমথ জিব বের করে নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলে, কি বলতে কি যে বলি! বসো, একটু জিরিয়ে নাও, তারপর কথা হবে।

রেবতী বড় ঘরের দাওয়ায় বসে এদিক ওদিক তাকায়। বৌটিকে বার বার দেখে।

প্রমথ পা ধুয়ে যথাসময় তাদের মাঝে এসে বসে।

তারপর বোন, কি খবর বল?

প্রমথর দরদমাখা স্বর ভারী ভাল লাগে রেবতীর।

সে মুখ নামিয়ে সলাজভাবে বলে, একটা বিহিত করতে হবে আপনাকে—

প্রমথ হাসিমুখে বলে, বিহিত করব বৈকি—নিশ্চয় করব। তোমাদের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে বুঝি?

কঠিন শুকনো মাটির দিকে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রেবতী উত্তর দেয়, না। চাষীর মেয়ের কপালে সুখ ভোগ সইবে নি।

সে কি কথা বোন? বৌটি রেবতীর পাশে সরে এসে তার একটা হাত ধরে বলে, চাষীর ঘরে ঘরে তোমার মতো তেজী মেয়ে জন্মালে কার সাধ্য চাষীকে মারে।

প্রমথ জিজ্ঞাসা করে, কি হল? তোমার বাপ ভাই বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করেনি?

এখন নাকি বিয়া করতে মত নাই তার?

মত নেই কেন? প্রমথ একটু অবাক হয়ে রেবতীর দিকে চেয়ে বলে, অত গরজ যার, আমাকে দৌড় করায় গোবরহাটায়—এখন অমত কেন?

মাথা তুলে রেবতী বলে, বেঠিক কিছু বলে নাই সে। কলে হাঙ্গামা হল, হাসপাতালে গেল। এখনও ঘরের বার হতে পারে নি। কাজ নাই। বিয়া করে খেতে দিবে কি মোকে?

প্রমথ মাথা নেড়ে বলে, ঠিক।

বৌটি রেবতীর প্রশংসা করে বলে, ভারী ঠাণ্ডা মাথা তোমার বোন।

এদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে রেবতী আবার গড়গড় করে মনের কথা নিজের ভাষায় স্পষ্ট করে বলে ফেলে, বাপ ভাই মানে না তার কথা। দিন রাত গাল দেয় বটে। মোকে দোষ দেয়। সহ্যি হয় না মোর। একটা বিহিত করেন আপনি।

পাখার বাতাস খেতে খেতে প্রমথ হেসে বলে, ধৈর্য্য ধরতে হবে বোন। সভা করেছ, তোমাকে নিয়ে মিছিল বার করে সকলে। তোমার সুখ্যাত করে পাঁচ গ্রামের লোক। তোমার মতো শক্ত তেজী মেয়ে লাখে একটা মেলে। তোমার সংগে বিয়ে হলে গোবিন্দ আবার তাজা হয়ে উঠবে।

প্রমথর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ হাতে স্বর্গ পাওয়ার

উত্তেজনায় রেবতী সোজা হয়ে বসে। অদ্ভুত রহস্যময় অদম্য প্রেরণায় তার মন চনচন করে ওঠে।

প্রমথ দৃঢ়স্বরে বলে, কারখানার কাজ গেছে, আবার হবে। না হয়, আর পাঁচজন মানুষ তো আছে। ভাবনা করে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? সাধ—আহ্লাদ বন্ধ থাকে নাকি মানুষের? বিয়ে তোমাদের আমি ঘটিয়ে দেব ঠিক শিগগির দেখো বোন।

মোর বাপ ভাইকে বলে কে একথা?

আমি বলব। গোবিন্দের সংগে কথা বলে তার বাপকেও আমি বুঝিয়ে বলব সব কথা। দেখি কেমন বিয়ে না হয় তোমাদের।

বেশী কথা বলতে হয় না রেবতীকে। প্রমথ সব নিজের থেকেই যেন বুঝে নেয়।

পুরুত হলে হবে কি, রেবতী ভাবে, বি, এ, পাশ কিনা, তাই এত বুদ্ধি।

মুখ খুলতেই মনের কথা টের পেয়ে যায়।

ছিল চাষীর মেয়ে
হল কুলির বৌ!

কাজ নেই বটে এখন গোবিন্দের। ক্ষেতে আর কাজ করবে না সে। কলে খাটার মজা পেয়েছে কিনা। তাই কাজ না থাকলেও কুলি বটে তো রেবতীর বর।

গোবিন্দ ও রেবতীর বিয়ে হল অগ্রহায়ণের শেষ দিকে।

পুরুত সেজে মন্ত্র পড়ল প্রমথ। গোবরহাটায় মামীর কাছে আর যাওয়া হল না। খবর পেয়ে মামীই এল বিয়ের মজায় ভাগ নিতে।

কিন্তু বেশী ফূর্তি আর কোথা থেকে হবে। রেবতী ছাড়া সবল সুস্থ মানুষ কোথায়।

দেহ যত শীর্ণ হচ্ছে কুঞ্জর, পেটটা তত মোটা হচ্ছে।

রাজু উঠে দাঁড়াতে গেলে টলে পড়ে যায়।

অঘোর সারাদিন শুধু খক খক করে কাশে। আর গোবিন্দও এখনও ভাল করে সেরে ওঠে নি। তবু প্রমথর কথায় সব দিক ভেবে সংগে গুটি কয় বন্ধু নিয়ে এল বিয়ে করতে।

মামী রেবতীর গালটা টিপে দিয়ে বলে, ধন্যি মেয়ে বাবা তুই। কোথা থেকে কি বশীকরণ শিখেছিস মুখপুড়ী ছুঁড়ী।

রেবতী বলে, কি করলাম। দুর্বল দেহ হলে হবে কি, বিয়ের সখ আছে মানুষটার।

মামী ধমক দিয়ে বলে, থাম্ বেহায়া মেয়ে। হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি তোর। আমি কিছু বুঝিনা ভাবিস?

মামীর দিকে চেয়ে রেবতী মৃদু মৃদু হাসে।

তেজপুর ছেড়ে স্বামীর সংগে বসবাস করতে রেবতী এল পাশের গাঁয়ে। একলাই এল। সাথী আর সে পাবে কোথায়। গোবিন্দের আপন জনেরা আছে অবশ্য এ বাড়ীতে।

কিন্তু রেবতী তাদের নাগাল পায় না।

ষাট বছরের বৃদ্ধ শ্বশুর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কটমট করে তাকায়। যেন ভস্ম করে ফেলবে তাকে। শ্বাশুড়ী সারাদিন রেবতীকে কটূ কথা শোনায়। অবহেলা করে। অপমান করে। তাড়না করে।

কটূ কথা বাপের বাড়ীতে ঢের শুনেছে রেবতী। কথা শোনাতেও দ্বিধা করে নি। কিন্তু এখানে মুখ একেবারে বন্ধ করে চলতে হয় তাকে। নতুন বৌ পাল্লা দিয়ে কোঁদল করে নাকি কোথাও। তাই রেবতীকে চুপচাপ সব গঞ্জনা সহ্য করে যেতে হয়। শ্বশুর বাড়ীতে মানিয়ে চলতে প্রাণান্ত হয় তার।

প্রথমটা রেবতী সত্যিই দিশাহারা হয়ে যায়।

গোবিন্দকে সে কাতরভাবে বলে, এ কোথা এনে ফেললে মোকে ?

গোবিন্দ বলে, আমি যেথা ঢের দিন থেকে আছি।

হেথায় রইতে পারবনি।

কোথা যাবে ?

রেবতী উত্তর দেয় না।

তাকে কাছে টেনে আদর করে গোবিন্দ বলে, এই তো তোমার নিজের ঘর।

আহা মরি, গোবিন্দের বাঁধন আলগা করে দূরে সরে গিয়ে চাপা স্বরে রেবতী বলে, ঘরের কি ছিরি। একটা মানুষ নাই দুটো কথা কইবার !

গোবিন্দ একটু হেসে বলে, আমি কি মরে গেছি ?

রেবতী রেগে গিয়ে ঝগড়ার সুরে বলে, এমন জানলে আসতাম না।

গোবিন্দ ঝগড়া করে না।

শুধু বলে, কেন, সব বলিনি আমি? কোন কথা লুকিয়েছি? কাজ না থাকলে মেজাজ বিগড়ে যাবে না বাপ মায়ের?

এখানে মানিয়ে চলা মোর সাধ্যিতে কুলোবে না।

যেভাবে পার কটা দিন আর চালিয়ে নাও।

রাগারাগি করবে না?

কখনো করেছি রাগারাগি? তোমার সেবা পাব বলেই না এই অবস্থায় বিয়ে করলাম। দিনরাত প্রাণ পুড়লে শরীর সারে নাকি মানুষের?

রেবতী সভয়ে এদিক ওদিক চেয়ে গোবিন্দের পাশে বসে তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, জানি গো জানি। কিন্তু নতুন অবস্থায় মেজাজ তো বিগড়ে যেতে পারে মানুষের নানা কারণে। সেইজন্য বললাম।

আমার মেজাজ বিগড়াবে না বৌ।

মোর মেজাজ বিশ্রী রকম বিগড়ে গেছে। রাগারাগি করতে বিষম ইচ্ছা হচ্ছিল। গায়ের জোরে চেপে গেলাম। চুপচাপ রইলাম।

গোবিন্দ বলে, আমিও তাই ভাবছিলাম।

রেবতী বলে, ভাবলে হবে না। ব্যবস্থা করতে হবে। এবার একটা কাজের খোঁজ কর।

গোবিন্দ একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই তার দিকে তাকিয়ে বলে,

করছি গো করছি। নিজে খোঁজ করছি। পাঁচ-সাত জনাকে বলা আছে। তারাও খোঁজ করছে। তোমার কষ্ট হাত-পা গুটিয়ে সইব, আমি এমন চামার ?

রেবতী হেসে বলে, জানি, জানি।

গোবিন্দ বলে, তুমি যে এ রকম ধীর শান্ত হবে, আমি তা ভাবতেও পারি নি বৌ!

রেবতী আবার মিষ্টি করে হাসে।

গেরস্ত-ঘরের মেয়েরা এমনিই হয়। তোমরা ব্যাটা-ছেলেরা তড়বড় কর। কোনদিকে তাকাও না। রাস্তায় চলতে সাপের লেজ মাড়িয়ে দিয়ে ছোবল খেয়ে মরতে বসো—ও রকম হলে কি মেয়েদের চলে ?

নতুন জীবনের নতুন পরিবেশ সইয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করে রেবতী। গোবিন্দকেও সে জানতে বুঝতে থাকে। মানুষটা ক্রমে ক্রমে নানাদিকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এই দিক দিয়ে রূঢ় আঘাত লাগে তার।

নিজের সুখ দুঃখ নিয়ে দিন রাত বিভোর গোবিন্দ। পরের জন্যে হাঙ্গামা করে যে মানুষটা মরতে বসেছিল, সে খুঁটিয়ে সেসব কথা বলে না রেবতীকে।

কলে কি কাজ তার, কেন হাঙ্গামা হল। কজন জখম হল, কজন মরল—সেসব কথা যেন বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই রেবতীকে। আবার কবে সভা হবে, আবার কবে চাষীর মিছিল বার হবে। এ রকম কথা কখনো বলে না গোবিন্দ। আফশোসে ফেটে যেতে চায় রেবতীর বুক।

কারো কাছে খুলে বলবার উপায় নেই। কেউ বুঝবে না। রেবতীর চীৎকার করে নালিশ জানাতে ইচ্ছে করে ভাগ্যের এই কুৎসিত জুয়াচুরীর বিরুদ্ধে। কিন্তু কিছুই সে করে না। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করা হবে না। সে ধৈর্য্য ধরে থাকবে।

অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য রেবতী দূর করতে পারে না।

অতিমাত্রায় ধীর স্থির শান্ত হয়ে থাকে।

কিন্তু গোবিন্দকে কিছু বলতে পারে না রেবতী। নিজের মনে গুমরে গুমরে জ্বলে। সব ফেলে ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে চায়। মামা-মামীর কথা মনে হয় তার। লোনা জলের পলি মাখা ক্ষেতের দিকে চেয়ে গোবর-হাটার কথা ভাবে।

গোবিন্দ ব্যাকুল হয়ে ভাবে, কি হল বৌয়ের। ত্রুটি হচ্ছে? অন্যায় করছে? নাকি তার বাপ-মায়ের গঞ্জনায় জর্জরিত হয়ে আছে রেবতী?

কাজ নেই তার। কলে খাটবার জন্যে বাপ-মা মোটেই প্রসন্ন নয় তার ওপর। বৌয়ের হয়ে তাদের কিছু বলতে গেলে নিন্দা রটবে। অথবা বাপের বাড়ী থেকে স্বামীর ঘরে এলে প্রথমটা এরকম হয় মেয়েদের?

কি হল তোমার বৌ?

কিছু তো হয়নি।

মুখ যে ভার ভার?

কই, না তো।

তুমি বড় কঠিন বৌ?

কেন গো ?

মন পাই না যে।

সাপে কাটার দিন মন তো নিয়ে নিয়েছো—

হঠাৎ যেন রেবতীর মুখ ভার করবার আসল কারণ আবিষ্কার করে গোবিন্দ বলে, পাঁচ-ছয়দিন পর কলকাতা যাব আমি—

স্বামীর কথা শুনে বিস্মিত চোখ মেলে রেবতী জিজ্ঞাসা করে, কলকাতা কেন যাবে ?

সেখানে কারখানায় কাজ করব।

এখানে কাজ হবে না তোমার ?

কি জানি। এখানে গোলমাল চলবে অনেকদিন। হাঙ্গামায় যাদের কাজ গেছে তাদের কবে কাজ হয় বলা বড় কঠিন বৌ।

রেবতী ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। যাদের জন্যে হাঙ্গামা করে কাজ গেল গোবিন্দের, তারা চুপ করে থাকবে নাকি ?

এ কি অন্যায় মানুষের।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে সে গোবিন্দকে একই কথা জিজ্ঞেস করে।

গোবিন্দ তাকে আদর করে বুঝিয়ে দেয়, কেউ চুপ করে থাকবে না। মুখ বুজে সব সহ্য করবার দিন আর নেই। তোড়জোড় চলছে গ্রামে জোর সভা করবার।

তবে কলকাতা যেতে চাও কেন ?

বাঃ, গোবিন্দ অবাক হয়ে বলে, এখানে থাকতে কষ্ট হয় না তোমার ?

কঠিন স্বরে রেবতী বলে, চাষীর মেয়ের আবার কষ্ট !

গোবিন্দ বলে, সব বুঝি বৌ। শরীর ঠিক থাকলে এমন হত না, একটু চুপ করে রেবতীকে পাগলের মতো ভালবেসে ও আবার বলে, বিয়ে করে ঘর কন্না নিয়েই মেতে রইলে ? এদিক ওদিক ঘুরে মজা মারতে সাধ যায় না ? কলকাতায় যাদুঘর আছে, চিড়িয়াখানা আছে, গড়ের মাঠ আছে—

জানি, জানি। কলকাতার ট্রাম বাসও চলবে, ওসব দেখার যায়গাও টিঁকে থাকবে। বেড়াব না তো কি, বেড়ানোর চোটে অতিষ্ঠ করে তুলব তোমাকে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রেবতী বলে, এত দুঃখী চাষীকে ফেলে পালিয়ে ফুর্তি মারতে যাব মোরা ? মন কাঁদবে না তোমার ?

কাঁদবেনা ? রেবতীর কথা শুনে উৎসাহে গোবিন্দ বলে, চাষীর ছেলের চাষীর তরে মন কাঁদবে না ?

তবে ?

চাষীরা আর বোকাহাবা নেই বৌ। খগেনবাবু আছে, প্রমথবাবু আছে, কত লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক আছে তাদের সুখ দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাবার তরে—

জানি, অনেকদিন পর গোবিন্দের কথা শুনতে ভারী ভাল লাগে রেবতীর।

কুলির তরেও আছে। শহরের কুলি হোক বা গ্রামের কুলি হোক, কল-কারখানার ব্যাপার তো এক। তাই দেখিনা, শহরটা কেমন।

তুমিও নতুন মানুষ দেখবে, নতুন জিনিষ দেখবে, নতুন কথা শুনবে—হাসিমুখে গোবিন্দ বলে, আর শহরে আবার যদি সাপে কাটে, বিষ চুষে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তুমি তো সাথে রইলে বৌ।

হঠাৎ ভীষণভাবে গোবিন্দকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয় রেবতীর।

কাজ হলেই কলকাতায় ঘর ঠিক করে রেবতীকে নিয়ে সেখানেই বসবাস করবে গোবিন্দ। গাঁয়ে আবার কবে ফিরবে—ফিরবে কিনা ঠিক নেই।

প্রতীক্ষায় দিন কাটে রেবতীর। চারপাশের মানুষগুলিকে বড় ভাল লাগে। দূরতর দেশের কল্পনায় শ্বশুর-শাশুড়ীর সংগে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়।

যত কাজ তাকে এখানে করতে হয়, তত কাজ বাপের বাড়ীতে রেবতী করেনি কোনদিন।

কাজ করতে ভয় পায় না রেবতী। চাষীর সবলা মেয়ে সে। শ্বশুর বাড়ির গঞ্জনায় কত চাষীর মেয়ে খেটে খেটে মরেছে। তাদের তুলনায় রেবতীর ভাগ্য অনেক ভাল বৈকি। গোবিন্দের মতো দরদী মানুষ গাঁয়ে কটা মেলে। বাপ-মা বিরূপ বটে এখন তার ওপর। নিজের সন্তানের ওপর বাপ-মা কতকাল আর বিরূপ থাকতে পারে।

রেবতীর ধারণা উল্টোপাল্টা হয়ে যায় গোবিন্দের বাপ

ক্ষেত্রর কর্কশ গলাবাজির চোটে। মুখে কথা জোগায়না রেবতীর।

ছেলেকে মোর পেরাণ দেছে। পেরাণ দেছে না তুক করছে—বশ করছে। চাষীর মেয়ে না তুই? লাজ-সরম নাই? ছেলেকে মোর টেনে নিয়ে যাস দূর দেশে—এইটুকু বলতে বলতে বুড়ো কেঁদে ফেলে।

গোবিন্দের মা গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে উঠতে বসতে টিটকিরি দেয় রেবতীকে, মেয়ে মোর কলির বেউলা। বেহায়া বজ্জাত মেয়ে। পেটে পেটে এত ছিল তোমার।

পেটে পেটে তার কি যে ছিল—রেবতী বুঝতে পারে না ঠিক।

পেটে পেটে কি আর থাকে মানুষের।

দুরবস্থায় মাথার ঠিক নেই গোবিন্দের আপন জনের। পাঁচমুখে সুখ্যাতি করেছে তো এরা একদিন রেবতীর। গরীব চাষীর ঘরের মেয়ে অসামান্যা হয়েছে বলে গর্ব বোধ করেছে।

অভাবে মেজাজ অমন বিগড়ে যায় মানুষের।

রেবতীর বাপ-মা ভাইও তো তাকে কত গালমন্দ করে। সত্যি কি আর ওরা বিরূপ তার ওপর।

অধৈর্য্য হয়ে গোবিন্দের কাছে অনুযোগ করতে গিয়েছিল বলে আফশোষ হয় রেবতীর।

তুচ্ছ ঘরোয়া শাপ-মন্যি কোঁদলে বিব্রত হয়ে পড়লে চলবে কেন তার। গোবিন্দের দেহ থেকে সাপের বিষ চুষে

বের করবার দিন থেকে জগতের রূপ পাল্টে গেছে তার কাছে।

শুধু অসংখ্য লোকের মুখ থেকে নিজের প্রশংসা কীর্তন শোনেনি সে।

রেবতী বুঝতে শিখেছে গরীব চাষাভূষো ঘরের মেয়েদের কথা, চাষীদের দুরবস্থার কথা, চাষীর লড়ায়ে মেয়েদের অংশ নেবার কথা।

এবার তাকে জানতে বুঝতে হবে কুলির ঘরের কথা, কুলির মেয়ে-বৌয়ের কথা, কলে খাটা মানুষের সুখ দুঃখের কথা।

শ্বশুর-শাশুড়ীর কটু কথায় অতিষ্ঠ হয়ে শুধু নিজের সাধ-আহ্লাদের হিসাব নিকাশ করে অভিভূত হয়ে থাকলে নীলকণ্ঠী কেন বলবে তাকে সারা গাঁয়ের শত শত লোক।

ঘরের কলহে দিশা হারিয়ে অথবা আপন জনকে নিয়ে বিভোর হয়ে মানুষকে ঠকাবে নাকি রেবতী ?

সভা করে মানুষ মিছেই তার গুণ গেয়েছে।

দিন দশ-বারো পর একদিন গোবিন্দ ফিরে আসে। তার মুখ দেখেই রেবতী টের পায় কলকাতায় কলে কাজ হয়েছে তার।

কেমন করে টের পায় সে-ই জানে।

গোবিন্দ হাসিমুখে বলে, বৌ, তৈরী হয়ে নাও। পরশু নাগাদ কলকাতা যেতে হবে।

বুকটা ধক করে ওঠে রেবতীর, কাল বাদ পরশু যেতে হবে নাকি মোদের ?

চট করে কাজটা পেয়ে গেলাম। ভোর ছ'টা থেকে ডিউটি। ভোঁ বাজে, গোবিন্দ মুখ দিয়ে শব্দ করে রেবতীকে শোনায়।

অমন হেথায়ও শুনি।

উদাস চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকে রেবতী। একটা অকথ্য বিষাদে তার সারা বুক ভরে যায়। গ্রাম ছেড়ে দূরতর দেশে যাওয়ার বিষাদ।

মনের এ ভাব কেটে যেতে সময় অবশ্য বেশী লাগে না।

গোবিন্দ ব্যাকুল হয়ে বলে, কি হল তোমার?

আর গাঁয়ে ফিরবনি মোরা? বাপ ভাই মায়ের সাথে দেখা হবে নি?

গোবিন্দ হেসে বলে, কেন হবে না? কলকাতা দূর নাকি বেশী? ইচ্ছা হলেই গাঁ ঘুরে যাব।

কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে থাকে রেবতী।

বাপের বাড়ীর কথা ভাবে।

গোবিন্দের দিকে কেমন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

কথা বলনা কেন বৌ?

মনের বিষণ্ণ ভাব ঝেড়ে ফেলে রেবতী বলে, মায়ের সাথে কথা কয়ে যাব দুটো—প্রণাম করে যাব।

যাবেই তো, গোবিন্দ সান্ত্বনা দেয়, কুঞ্জকে পথে সব বলেছি আমি। পরশু যাবার পথে তেজপুর হয়ে যাব।

রেবতী খুশী হয়ে বলে, সেই ভাল।

বাপ-মা হাজার গালমন্দ করলেও শ্বশুরবাড়ী এসে কোন মেয়ের বাপের বাড়ীর কথা মাঝে মাঝে না মনে হয়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রেবতী কলকাতার সব খবর জেনে নেয়। কোথায় বাসা করেছে গোবিন্দ। কারখানা সে-বাসা থেকে কতদূর।

এমন আদালতী জেরা চলে অনেকক্ষণ।

গোবিন্দ হাসিমুখে রেবতীর সব প্রশ্নের জবাব দেয়। বাসা আর কোথায় পাব?

যথাসাধ্য বর্ণনা দেবার চেষ্টা করে গোবিন্দ, বস্তিতে একখানি ছোট ঘর।

মোটে একখানি ঘর।

কলে খাটা মানুষ কলকাতায় একখানি ঘরে থাকে নাকি।

গোবিন্দ বলে, একটা দরজা এবং নামমাত্র একটা জানালার ঘুপচি।

গোবিন্দের কথা শুনে রেবতীর চোখের সামনে ছবি ফুটে ওঠে না কোন।

সে জিজ্ঞাসা করে, রান্না করব কোথা?

গোবিন্দ বলে, রান্না বান্না, শোয়া-বসা, ঘুমানো সব কিছু ওই এক ঘরে। রাস্তার কল থেকে মারামারি করে জল এনে তোমাকে দিন চালাতে হবে।

রেবতী বলে, যে-ঘরে শোব, সে-ঘরেই আখা জ্বালাব, রাঁধা বাড়া করব?

গোবিন্দ বলে, তা ছাড়া উপায় কি? আরেকটা ঘর ভাড়া নেবার সাধ্যি আমার নেই। এই ঘরের জন্যে সাত টাকা ভাড়া গুণতে হয়।

রেবতী বলে, তবে চালিয়ে নেব।

বস্তি খুব বড়। এলেমেলো ভাবে গায়ে গায়ে লাগানো কাঁচা ঘর, পৃথক পৃথক তিন ফালি উঠান।

ভিন্ন ভিন্ন গোটা চারেক বস্তি গড়ে ওঠাই উচিত ছিল কিন্তু মালিকের মর্জি এবং হিসাবটা অন্য রকম হওয়ায় ঠসাঠাসি, গাদাগাদি করে ঘরগুলো তোলা হয়েছে। একরত্তি পরিমানের তিনফালি উঠান থাকলেও, সবটা মিলে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি মাত্র বস্তি।

রেবতীকে ছেড়ে একা একা সহরের বস্তির ঘরে দিন কাটাবার ধৈর্য্য গোবিন্দের নেই। সকলের নিন্দা তুচ্ছ করে সে তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে।

ভোর বেলা কানাই গরুর গাড়ী নিয়ে হাজির হয়।

থানার পেটা ঘড়ি অনুসারে মালপত্র গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে ছ'টা নাগাদ রেবতী আর গোবিন্দ রওনা হয়।

মালপত্র আর কি, কয়েকটা টিন, মাদুর-বালিশ আর সংসারের টুকিটাকি ছোটখাট জিনিষ।

বুড়ো ক্ষেত্র চোখ বুজে থাকে। কথা বলে না।

গোবিন্দের মা বিড় বিড় করে আপন মনে বকে যায়। ছেলে—বউকে বিদায় দিতে বাইরে এসে দাঁড়ায় না।

শীর্ণ বলদ দুটোকে সতেজ করে তোলবার জন্যেই কানাই তাদের লেজে মোচড় দিয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে।

লেজের মোচড়ে বিব্রত হয়ে গলার ঘণ্টা জোরে জোরে বাজিয়ে বলদ দুটো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে।

প্রস্তুত না থাকার জন্যে হঠাৎ ঝাঁকুনির চোটে গরুর গাড়ীর মধ্যে দুর্বল গোবিন্দ গড়িয়ে পড়ে রেবতীর গায়ের ওপর।

শীতের কনকনে বাতাসটা সাপের ছোবলের মতোই মনে হয় বটে তার।

রেবতীকে হাসতে দেখে তাজ্জব বনে যায় গোবিন্দ।

এক জায়গার পাট তুলে অন্য কোথাও বাসা বাঁধতে গেলে মেয়েরা হাসে না বলেই তো এতকাল জানা ছিল গোবিন্দের।

রেবতীর হাসির হদিস পাওয়া সাধ্যিতে কুলোয় না তার।

অদম্য কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করে, হাস কেন বৌ?

জবাব দেয় না রেবতী।

কুলির বৌ হয়ে কুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চলেছে বলেই, কুলির সুখে দুঃখে লড়ায়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবে মনে করেই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার বিষাদ জুড়িয়ে যায় রেবতীর।

হাসি ফোটে সেই কারণেই।

কথাটা গোবিন্দকে বলবার ভাষা জোগায় না মুখে।

সদরের দিকে নয়।

গরুর গাড়ী যায় তেজপুরের দিকে।

তারপর ওরা যাবে সোজা কলকাতার দিকে